হিয়ে হিয় রাখনু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ :
৭ই কার্তিক,
১৮৮২ শকাব্দ

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

এক

সমস্ত রাত বৃষ্টি গেছে। আকাশের হৃদয়ে এক সমুদ্র স্নেহ ছিল, সব উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে পৃথিবীর হৃদয়ে।

ঘুম ভাঙতেই আনন্দ শিয়রের জানলা খুলে দাঁড়াল। কী ঘন সবুজ হয়েছে গাছ-পালা। কী ঘন সবুজ হয়েছে ঘাস। যেন কত দিনের খিদে মিটেছে, অনিদ্রা মিটেছে। বুক ভরা সুখ নিয়ে কোমল চোখে তাকিয়ে আছে। কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে, হৃদয়ে যত নম্রতা আছে সব হাতের মধ্যে এনে ওদের ছুঁই, লতা-পাতা ঘাসকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলি, তোমাদের শান্তিতে আমারও শান্তি।

আর সেই মুহূর্তে পাশের বাড়ির ঠিক মুখোমুখি ঘরের জানলা খুলে দাঁড়াল সুষীমা।

এমনও হয়? এমনও ঘটে না কি সংসারে?

খট করে একটা শব্দ হতেই চোখ এদিকে ফিরিয়েছিল আনন্দ। কিসের শব্দ? ছিটকিনি খোলার শব্দ। বন্ধন থেকে ছাড়া পাবার শব্দ।

সঙ্গে-সঙ্গেই খুলে গেল কাঠের পাল্লা দুটো। কিন্তু কাঠের আবরণের অন্তরালে এমন আবির্ভাব ছিল তা কে জানত। চোখের আড়ালে এমন একটি সোনার ভোরবেলা।

চার দিকের অঢেল সবুজের মধ্যে এও যেন আরেক সবুজ। শ্যামলের সঙ্গে মিশেছে নির্মল হয়ে।

তবে ওরাই কাল এসেছে রাত্রে। কী অঝোর বর্ষণই না ছিল

যখন ওরা আসে। বুঝি একটা গোটা বাস রিজার্ভ করেই সটান এসেছে কলকাতা থেকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছে বলে বেশ রাত করেই এসেছে হয়তো। পথের মাঝখানেই বৃষ্টি নেমেছে। আনন্দ তো জানে কখন শুরু হল বর্ষণ। সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে নটা। তখনো আকাশে তারা ছিল মনে আছে। নদীর ওপার থেকে একটা তারা তো ঠিক তার মুখের ওপরেই প্রস্ফুট চেয়ে ছিল। যেন অবধারিত একটা সুসংবাদ। চেনা চোখে যেন তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে উপরে আসতে আসতে দশটা। বাবা জেগে। নিয়মরক্ষার জন্যে পড়ার টেবিলে বসবে, না, দরজা সটান বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে ছবির মার্কিনি ম্যাগাজিনগুলো দেখবে তাই ভাবছে, হঠাৎ মেঘ ডেকে উঠল। কী ব্যাপার? মুখের সিগারেটটা তখনো ধরানো হয়নি, ব্যস্ত হয়ে জানলায় দাঁড়ালো আনন্দ। কী আশ্চর্য, আকাশ মর্মন্তুদ কালো হয়ে উঠেছে; কেউ আসবে আশায় তীক্ষ্ণ রক্ত যেমন কালো হয়ে ওঠে তেমনি আকাশের চেহারা। কোথায় ছিল এত রাজ্যের মেঘ, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত যেন এক ঢেউয়ে আঁচল টানা হয়েছে—জামার উপরে-নিচে আশে-পাশে পাওয়া যাচ্ছে না এতটুকু একটু গায়ের রেখা। হঠাৎ দেখার খুশির মত কোথাও জেগে নেই এক ফোঁটা একটা অসতর্ক তারা। আবৃতা রাত্রি তার নিভৃত কক্ষের উত্তপ্ত শয্যায় রুদ্ধশ্বাসে শুয়ে আছে। কে যেন আসবে। এসে সমস্ত আবরণ আভরণ নখে-দাঁতে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলবে, উন্মত্তের মত তছনছ করে দেবে সমস্ত লজ্জার জড়িপটি। কালো আকাশ নীল হবে। নগ্নতায় নীল।

এল ঝড় এল বৃষ্টি। খাপখোলা তরোয়াল হাতে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসেছে কোন রণমদির রাজপুত্র।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল আনন্দ। অন্ধকারে বৃষ্টি কী অপূর্ব লাগছে! আকাশ আর মাটি, জল আর অন্ধকার, শব্দ আর ঘুম, শরীর আর মন, আকাঙ্ক্ষা আর অতৃপ্তি সমস্ত একাকার হয়ে গিয়েছে।

আনন্দর মনে হচ্ছিল ঘরের আলোটা একটা বাধা। নিঃসঙ্গতার কবিতায় ছোট অথচ তীক্ষ্ণ ছন্দপাত। সিগারেটটা শেষ হলে নতুন আরেকটা ধরাল না। তিরস্কারের মত জলের ছাট আসছে মুখে-চোখে। জানলা বন্ধ করল। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে এক মাঠ শব্দ নিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

ঘুম আসবে কি এখুনি? না, চোখ বুঁজে শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনবে? বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়বে তার ঠিক কি। না, যতক্ষণ পারে জেগে শুনবে সে শব্দ। কিন্তু ঘুম আসবার আগেই যদি বৃষ্টি থেমে যায়, শব্দ থেমে যায়? সে এক হতচ্ছাড়া কাণ্ড হবে। যেন মন রাজি হব-হব হতেই সুযোগটি উড়ে গেল। তার চেয়ে শব্দের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি। সমস্ত ঘুম এক মাঠ বৃষ্টি হয়ে ঝরুক, ঝরে পড়ুক শরীরে।

ঘুম? ঘুমের আচ্ছাদনের পিছনে কী আছে? কী হয় যদি ঘুমকে ছিঁড়ে ফেলা যায়? তার ভিতর থেকে ফুটে বেরুবে না কি এক নিটোল স্বপ্ন? ঘুমের রুপোর কৌটোর মধ্যে কি সোনার স্বপ্ন থাকে না লুকিয়ে?

'কটা বাজে? এখুনি, এরি মধ্যে শুয়ে পড়লি?' ওপার থেকে ধমকে উঠলেন ত্রিদিববাবু। 'এরকম করে চললে আর কী হবে?'

আর যদি কিছু নাই হয়, মুখে কুলুপ এঁটে শুয়ে পড়লেই চলে! অন্ধকারের সঙ্গে, অন্ধকার ভবিষ্যতের সঙ্গে কে লড়াই করে মুখোমুখি? শুধু যে একটা আদর্শের স্পষ্টতা নেই তা নয়, নেই সামান্য কর্মনিষ্ঠা, [illegible]

পরিশ্রম করবার উৎসাহ। আলস্য আর আরামের কুণ্ডলী, এ-সব যুবক দিয়ে কী হবে স্বাধীন ভারতের ?

উড়নতুবড়ির ফাঁকা বক্তৃতাটা মাথার উপর দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যায় তো যাক, ত্রিদিববাবু এবার অন্তরটিপুনির ছুঁচোবাজি ছুঁড়লেন। আজকালকার দিনে কে আবার ল পড়তে যায় ? পরের ঝগড়া-মারামারির উপরেই যদি খাবি ঠিক করে থাকিস তবে অত দেরি করলি কেন ? ম্যাট্রিক পাশ করে মোক্তার হলেই তো পারতিস—এত দিনে একটা চলনসই চেহারা না হলেও চেকনাই ফুটত। মোক্তারি করতে লাগে কী ? শুধু নেই-আঁকড়ামি। যুক্তি-বুদ্ধি না মেনে নিজের কথায় আঁকড়ে থাকা। সূর্য ঘুরে যাক মোক্তার ঘুরবে না। সেই একমাত্র ভদ্রলোক যেহেতু তারও এক কথা। তারই মতন একগুঁয়ে হয়েও কিন্তু বুদ্ধিতে ধারালো নয়। নইলে ল যখন পড়ছিস সেই সঙ্গে এম-এটা কেউ না পড়ে ? তারই মানে বেকারির বাবুগিরি করা। দেখাচ্ছে, পড়ছে— কী বা ছাই পড়া—আসলে বই নেড়ে-নেড়ে হাওয়া খাওয়া। শিক্ষিত বেকার শুনেছি, এ হচ্ছে দীক্ষিত বেকার।

অথচ তোরই বয়সের কত ছেলে এরই মধ্যে চাকরি-বাকরি নিয়ে কেমন গুছিয়ে বসেছে। হলই বা না টিমটিমে বা মিটমিটে চাকরি কিন্তু যা সাধ্যি সংসারের আয় বাড়াচ্ছে সকলে। আর তুই একটা জোয়ান-মর্দ ছেলে, ইংরিজিতে যাকে বলে গ্রাজুয়েট, তোর কিনা এই মতিগতি ! না ছাতা না মাথা। *ছাত্র হোস তো পড় বুক দিয়ে, ড্রপ-ষ্ট্রপ না করে তাড়াতাড়ি পাশ করে ফ্যাল, আর যদি মানুষ হোস তো, মাটি খোঁড়,* পাথর ভাঙ, নদী ডিঙো, পাহাড় টলা, একটা চাকরি যোগাড় করে আন, রোজগারের চেকনাই দে। তা নয়, দশটা বাজতে না বাজতেই লম্বা হয়েছেন। অকর্মার ধাড়ি। কিন্তু এদিকে বই কত, কত পত্র-পত্রিকা। নাপিতের বোঝাভরা ক্ষুর।'

ঘন শান্তিতে একটু শীতলতার শব্দ শুনবে, তা নয়, কানের কাছে চলেছে এই টিয়ার-গ্যাস। চোখ-নাক ঝাঁঝানো গালির গুলি। তবু বাঁচোয়া, বাবার মুখখানা এখন দেখতে হচ্ছে না। কী করবে? উঠে আলো জ্বালাবে? বাধ্য ছেলে, পড়ছে এই ভান সৃষ্টি করে দেখবে ছবির ম্যাগাজিনগুলো? যেগুলো সেদিন কলকাতা থেকে কিনে এনেছে নতুন? অর্ধেক চামড়া তুমি অর্ধেক পোশাক—সেই এক তাল ওথলানো প্রগল্ভতা!

একবার তো দেখেছে, আবার কী দরকার! পাশ ফিরল আনন্দ, দেয়ালের দিকে মুখ করল। কিছু ঢাকা কিছু আঢাকা কতগুলো ভঙ্গিম-বঙ্কিম উদ্বেল-বিহ্বল বিদেশী মেয়ের ছবি। বিপজ্জনক সংক্ষিপ্ততায় বেশ-বাসকে বিন্যস্ত করে শুয়ে বসে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। সতর্কতার সংকীর্ণ একটু তটরেখা বাঁচিয়ে ফেনিল বন্যার ঢেউ। শাসন-না-মানা যত সব আসন-শয়নের ঔদ্ধত্য। একজনের তো শুধু তিনটি গ্রন্থিতে তিনখানি রুমালই সম্বল, আরেকজন তো আচ্ছাদনকে স্বীকার করে নিয়েও দুরূহ স্থান ক'টিতে উন্মুক্ত। লজ্জা, এমন সুন্দর লজ্জা, সে যে শুধু লুব্ধতার নামান্তর হতে পারে দেখলে রাগ হয়। আর হাসি, এমন সুন্দর হাসি, সে যে শুধু এক পিচ্ছিল ইচ্ছারই বাহন, আর কিছু নয়, মনে হলেই ঘেন্না ধরে। যাই বলো, ও তো একবার দেখলেই শেষ। আর কোথাও তা এগিয়ে নেয় না, দেয় না কোথাও পৌঁছে। চোখের তা হলে আর আশা কই, প্রীতি কই, আনন্দ কই?

তাই ছবি দেখে ছবি ভেবে ছবিতে মন ডুবিয়ে কী হবে? ছবির চেয়ে স্বপ্ন অগাধ। স্বপ্ন অফুরন্ত। আচ্ছাদে-উচ্ছেদে অফুরন্ত। মূর্তির মৃত্যু আছে, স্বপ্ন মৃত্যুহীন।

কখন ঘুম এসে গেছে, ধুয়ে মুছে দিয়েছে বাবার গালাগালের কালি, কে জানে। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ কতগুলি যেন শব্দ শুনেছিল

ভাঙা-ভাঙা। মানুষের শব্দ। যেন অনেকে মিলে কিছু বলছে, তার মধ্যে হাসি, উল্লাস, ডাকাডাকি, বকাবকি—সবই যেন বৃষ্টির সুরে সুর বাঁধা। ঘুম ভাঙো-ভাঙো হয়েও ভাঙেনি। বৃষ্টির ঝমঝমই কানে শেষ পর্যন্ত লেগে রয়েছে। চোখে বুঝি কে নিদালির ধুলো পড়ে দিয়েছিল। ঘুমন্ত গৃহস্থের চোখে যেমন চোর দেয়।

চার দিক থেকে উঠেছিল অনেক নালিশের হাঁক-ডাক, কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে হাসি, হাসির খিলখিল।

আর সে-হাসি বুঝি শুধু এক জনের।

এ সব আনন্দ শুনেছিল না কি অনুমান করছে!

একটা যেন বাস এল অনেক রাতে। ছাদের উপর সব বাক্স-পত্র ছিল, মায় মোটা বিছানাগুলি—বিছানাগুলি ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছে। কলকাতার থেকে মাত্র মাইল তিরিশ-বত্রিশের রাস্তা, বিছানা তেমন জবরদস্ত করে বাঁধা হয়নি, গিয়েই তো মেলে-ছড়িয়ে শুয়ে পড়বে। সব কিছুই ঢিলে-ঢালা ছিল, সাজগোজ, আঁটা-সাঁটা। কোনো রকমে একবার গিয়ে পড়তে পারলে সমস্ত এলোমেলোকে সংযত করে নেওয়া যাবে, আনা যাবে শৃঙ্খলার কবিতা। এখন তো হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ি।

কিন্তু পথের মাঝে বৃষ্টি নামবে কে ভেবেছিল? আর এমনি অন্ধ-বন্ধ-করা বৃষ্টি। সতর্ক হবার সময় দেয় না, একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবারও আশ্বাস রাখে না কোথাও। বিচার নেই বিতর্ক নেই জিজ্ঞাসা নেই। প্রেম যেমন আসে তেমনি যেন বৃষ্টি এল।

'ওহে কণ্ডাক্টার, তেরপল আছে?' প্রশ্ন করলেন সুধীনবাবু।

'তেরপল কোথায় পাব?'

'তাই বলে আমাদের বিছানাপত্র সব ভিজে যাবে?' ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন সুব্রতা।

'তার আমি কী করব।' কণ্ডাক্টার নির্লিপ্ত মুখে বললে।

'তা হলে খাসা তোমাদের বাস রিজার্ভ করেছিলাম। গলায় পুরো ঝাঁজ রেখে বললেন সুব্রতা।

'মানুষ আর জিনিস বয়ে নিয়ে যাব এই তো শর্ত, ঢাকাঢুকি দিয়ে নিয়ে যাব এমন কোনো কথা ছিল না।' পিছনের দিকে কোণ ঘেঁষে বসে ছিল কণ্ডাক্টার, কোণ ঘেঁষেই ছাড়ল কথাটা।

'লোকটা কী রকম কথা বলছে দেখ না।'

'কী রকম বলছি।' নড়ল না চড়ল না, কণ্ডাক্টার বললে পাথুরে ভঙ্গিতে।

'তুমি কিছু বলছ না কেন?' স্বামীকে সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্য করলেন সুব্রতা।

'লোকে আজকাল অমনি করেই কথা বলে। ভালো কথা ন্যায্য কথাও লোকে তেরছা করে তেরিয়া হয়ে বলে। মিষ্টি করে বলার দিন উঠে গেছে। যেমন যুগ তেমনি হাওয়া—' প্রায় আপন মনে বলার মত করে বললেন সুধীন।

কী মনে করে সশব্দে হেসে উঠল সুষীমা। বললে, 'যেমন ভানু তেমনি হনু।'

একটা বিড়ি ধরাল কণ্ডাক্টার।

'মাঝপথে আচমকা বৃষ্টি নামলে প্যাসেঞ্জারদের মালপত্র কী করে রক্ষে হয়?' বিনীত সুরে জিগগেস করলেন সুধীন।

'কী করে হবে? হয় না।' ধোঁয়া ছাড়ল কণ্ডাক্টার।

'অত তর্কের কী আছে।' এবার ড্রাইভার আসরে নামল: 'ট্রেনে দেখেন নি বিজ্ঞাপন—নিজের মালের দিকে নজর রাখুন। এখানেও তাই। মাল যদি আপনার তেরপলও আপনার। রাখবেনও আপনি ঢাকবেনও আপনি।'

'আমরা কি জানি পথের মাঝখানে এমন কুচ্ছিত বৃষ্টি নামবে?' সুব্রতার ধারণা নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা আছে, ড্রাইভার-কণ্ডাক্টার ইচ্ছে করেই হাত লাগাচ্ছে না। ইচ্ছে করে মানে, হাত একটু তৈলাক্ত করলেই প্রসারিত হবে এখুনি।

'আর আমরাই কি গুনতে পারি?' পালটা জবাব দিল ড্রাইভার। 'আর গুনে বৃষ্টি দেখে দোকান থেকে ভাড়া করে আনব তেরপল?'

ড্রাইভার কথা কইতে শুরু করলেই কেলেঙ্কারি। বিপদ না বাধায়।

কিন্তু মেয়েদের কণ্ঠনালী তুমি কী করে রোধ করবে? এবার ঝলসে উঠল আরতি, সুধীনের বোন। 'এ হতেই পারে না, এর কোনো ব্যবস্থা নেই। মানে বাড়তি কিছু পেলে তবে—'

'বাড়তি! আবার বাড়তি কিসের?' এবার আবার সুব্রতার পালা: 'গোটা বাসটা আমরা ভাড়া নিইনি? যদি তেরপল থাকে বাসের মধ্যে তা হলে সেই তেরপলও।'

বিজ্ঞ যেমন অবোধের দিকে চেয়ে হাসে তেমনি মৃদু রেখায় হাসল কণ্ডাক্টার।

'তেরপল নেই, না?' বিগলিত ভঙ্গিতে জিগগেস করলেন সুধীন।

'তাই তো বলছি এতক্ষণ।' বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে কণ্ডাক্টার বললে, 'এ সোজা কথাটাও যদি মাথায় না ঢোকে তা হলে কী করতে পারি বলুন?'

'কিন্তু এদিকে সোজা কথা মাথায় ঢোকাবার আগে বিছানাগুলো বাসের মধ্যে ঢোকানো সোজা ছিল না?' হেসে উঠল সুষীমা।

'আজ্ঞে না।' কণ্ডাক্টার ভাবল এ প্রশ্নটাও বুঝি তাকেই করা হয়েছে। উত্তর দেওয়া তাই সমীচীন মনে করল। বললে, 'যে রকম বেঢপ করে একেকটা বেঁধেছেন সাধ্য কি সরু হয়। আজকাল

বালিশ-তোশক তো বাক্সে নেয়। কে অমন করে বাঁধে ফাঁসিকাষ্ঠের আসামীর মত। সেই কেমন একরকম সুন্দর বাক্স বেরিয়েছে—'

'তোমার বুঝি সবতাতেই কথা কইতে হয়!' সুধীন নির্ভাজ গলায় বললেন।

'তা কেন হবে? কিন্তু লোকে প্রশ্ন করলে জবাব দেব না এটা কোন্‌দিশি ভদ্রতা! কথা শুনতে না চান কইব না।' কণ্ডাক্টার সামনের সিটে পা তুলে পিছনে হেলে বসল, চোখ বুঁজে বললে, 'দয়া করে তবে তেরপল-সামিয়ানার বায়না ধরবেন না।'

'বিছানার খোলসটা খুলে ফেলে ভিতরের সার-শস্য কিছু আনা যায় না বাবা?' সুধীনের দিকে তাকাল সুষীমা: 'অন্তত ক'টা বালিশ?'

'কিন্তু কে ছাদের উপরে উঠবে বৃষ্টিতে?' চোখবোঁজা ঘাড়হেলা অবস্থাতেই বললে কণ্ডাক্টার।

'এ প্রশ্নটা কি তোমাকে করা হয়েছে?' মুখিয়ে এলেন সুব্রতা।

'কিন্তু ছাদে উঠতে আমাকেই অনুরোধ করা হত। উত্তরটা তাই আগে থেকেই সেরে রাখলাম।'

আরতি বললে, 'বাসটাকে কোথাও দাঁড় করালে কেমন হয়?'

'এটা কি ট্রেন আর সামনে কি কোনো ঢাকা ইস্টিশান আছে যে সেখানে দাঁড়াবে দুদণ্ড?' টিপ্পনি কাটল দেবল, আরতির ছেলে।

'আর দাঁড় করাবে তো মাঠের মধ্যে।' বললে সুনন্দ, সুষীমার ছোট ভাই। 'দাঁড় করানো মানে খাড়া বৃষ্টিকেই মাথার উপর দাঁড় করানো। কে ভিজবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? বিছানা বাঁচাতে গিয়ে নিজে শেষে বিছানায় পড়া।'

'আর কে জানে, না বাঁচা।' কথা কইবেই কণ্ডাক্টার।

আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন সুব্রতা, ড্রাইভার মাঝে পড়ল। বললে,

'ভাড়াটে বাসে সারাক্ষণ চেঁচানো, সোয়ারীদের সঙ্গে ঝগড়া-বচসা, পথের এলোমেলো আলাভোলাদের থেকে শুরু করে গরু বাছুরকে পর্যন্ত খেদানো, বকযন্ত্রের, অর্থাৎ যে যন্ত্রে সর্বদা বকবক করছে তার, কামাই নেই। এখনো তাই মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে পাচ্ছে না। ধমক দিতে তো পাচ্ছে না। তাই টীকা-টিপ্পনী কাটছে।'

'যাক, আজ ঘুমের দফা রফা।' সদীর্ঘশ্বাসে বললেন সুধীন।

'শুধু আজ?' সুব্রতা আকাশের চেয়েও ঘোরালো করলেন চোখ-মুখ। 'কত দিনে বিছানাপত্র শুকোয় তার ঠিক কি!'

'কত দিনে থামে এই কালোবৃষ্টি!' যেন কত স্ফূর্তি এমনি করে বললে সুষীমা।

'কী বললি দিদি, কালোবৃষ্টি?' চমকে উঠল সুনন্দ: 'তার মানে?'

'তার মানে ভালোবৃষ্টি। কালোই তো ভালো।'

'ভালোবৃষ্টি মানে?'

'যে বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে থাকে। কালোর রূপই তো অনেকক্ষণের রূপ।'

'অনেকক্ষণই ঘুমিয়ো ভিজে বিছানায়।' সুব্রতা টিটকিরি ছুঁড়লেন।

'সত্যি, ঘুমুতে না পেলে শরীরের কী দশা হবে কে জানে!' আরতি চিন্তিত মুখে বললে, 'আমাদের না হয় যেমন তেমন কিন্তু দাদার জন্যে ভাবনা।'

'কেন, একটা মরুভূমির মধ্যে গিয়ে পড়ছি নাকি?' সুব্রতা মফস্বলি চাকরির তেজ ফোটালেন: 'পাড়াপড়শীরা দিতে পারবে না কটা বিছানা যোগাড় করে?'

'কটা বিছানা?' সুধীন হাই তুললেন: 'একেবারে বাড়তি সব স্তুপ-স্তুপ আছে কিনা সকলের বাড়িতে!'

'আমার একখানা মাতুর আর একটা বালিশ পেলেই যথেষ্ট।' বললে সুষীমা।

'কেন, এতই বা কেন?' সুব্রতা টিপ্পনী কাটলেন, 'শুধু শুকনো মেঝেতে চলবে না?'

'তাও চলবে, যদি দু চোখ ভরা ঘুম থাকে, মা।' দু চোখ ভরা সলজ্জ খুশি নিয়ে সুষীমা বললে, 'ঘুমের মত বিছানা নেই।'

'আর সন্তোষের মত বিত্ত নেই।' জুড়লেন সুধীন।

'কিন্তু, আহা, মশারি লাগবে না?' ঝাপটা হানল আরতি: 'কী একখানা মশার দেশ তা খেয়াল আছে?'

'মশারি ট্রাঙ্কে নয়?' সুষীমা চেঁচিয়ে উঠল। তার মেঝে-মাতুরের স্বপ্ন বুঝি ধূলিসাৎ হয়।

'মশারি আবার ট্রাঙ্কে কে নেয়?' শূন্য চোখে উপর দিকে তাকালেন সুব্রতা: 'সব ঐ একসঙ্গে এক বাণ্ডিলের মধ্যে।'

'এক নিবিড় বেষ্টনীর মধ্যে।' জুড়লেন সুধীন: 'এক ফুলশয্যায়।'

কে জানত কালবোশেখির আকুল বৃষ্টি এমন রাত করে আসে! পুরো আষাঢ়-শ্রাবণের রাত হত, সাবধান হওয়া যেত, বিছানাটা নানা শীর্ণ অংশে বিভক্ত করে নেওয়া যেত বাসের মধ্যে। যখন রওনা হই তখন তো আকাশ-ভরা তারা। কে জানত চক্ষের অগোচরে এমন পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ আসবে, সঙ্গে নিয়ে আসবে ধুলোবালি-ওড়ানো ঝড়ের পাগলামি। একেবারে গালে চড় মেরে বোকা বানিয়ে ছাড়বে।

সাধ্য নেই এই ঝড়বৃষ্টি সম্ভোগ করো। ঘুমুতে পারবে না এই দুশ্চিন্তা যদি জেগে থাকে তাহলে বৃষ্টিতে সুখ কই? যদি ভয় জেগে থাকে, তাহলে শান্তি কই ভালোবেসে?

নইলে ঘরে তোমার তপ্তশয্যা আছে নিখুঁত, দেয়াল-ছাদ অব্যাহত, জানলা-দরজা মজবুত, শরীরময় বিশ্রামের স্পৃহা, দুই চোখে ঘুম-ঘুম

আলস্য—আসুক না আকাশভাঙা বৃষ্টি, পথ-ঘাট ডুবে যাক, গাছপালা ভেঙে পড়ুক, বাঁধ ভাঙুক ভরপুর নদীর, কী যায়-আসে!

কী সুন্দর ঘুমিয়েছে কাল আনন্দ! ঘুমের আলিঙ্গনে যখন বিস্তৃততর হয়ে বিছানার অন্যধারে গিয়েছে, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লেগেছে, খানিকক্ষণ পরে স্পর্শের ঘনতায় সেখানে নিয়ে এসেছে উত্তাপ। তখন আর এ-পাশ ছেড়ে দিতে চায় না ও-পাশকে। যা উদাসীন যা পরাঙ্মুখ তাকে উষ্ণ করা উৎসুক করা কত বড় জয়। আর যে উষ্ণ সেই তো উৎসুক। যে স্মরণে উষ্ণ সেই তো ক্ষরণে উৎসুক।

রাতের বৃষ্টি সকালে এসেও ক্ষান্ত হয় নি এরও যেমন রূপ আছে, আবার সকালের গা ঘেঁষে এসে থেমে পড়েছে এরও রহস্য অগাধ। অকালের বৃষ্টি তো, বোধ হয় দীর্ঘায়ু হতে জানে না, একটা লণ্ডভণ্ড বাধিয়ে ক্ষান্ত হতে পারলেই খুশি, বর্ষার আয়ত-শান্ত মমতার মত বিস্তীর্ণ হতে জানে না। কিন্তু উদ্দামতারও একটা রস আছে। তাণ্ডবেও ছন্দ আছে। যা ভয়ঙ্কর তাও মোহঙ্কর। যা অল্পক্ষণ থেকে বেশিক্ষণ আন্দোলিত করে তার আনন্দ অফুরন্ত।

আকাশে সোনা-সোনা ভোর কিন্তু জানলার ঐ মেয়েটি হাসে না কেন? ও তো হাসবার জন্যে জন্মেছে, তবে কেন এমন ঘোর-ঘোর মেঘলা-মেঘলা? রোদ না উঠতেই কেন অমন রুখু-রুখু? এখন তো চারিদিকে বৃষ্টিধোয়া সবুজের স্নেহ, তার সঙ্গে মিল রেখে ও-ও ওর দেহে একটি শ্যামল লাবণ্যের প্রলেপ আনুক, আর আকাশে যে সোনালি রেখার আভা ফুটেছে তাই ও মাখুক ওর দু' ঠোঁটে।

আসলে কী! আসলে চোখের চাউনিতে একটি মধু আর ঠোঁটের কিনারে একটু হাসি।

তা হলেই, তা হলেই তুমি সুন্দর। তা হলেই জীবনের অভিধানে তোমার যৌবনের মানে। আর, আমার চোখের উপর যদি তোমার

চোখ না পড়ে তা হলে তোমার দৃষ্টিতে মধুই বা ঝরে কি করে, ঠোঁটের কিনারে হাসিই বা আসে কোত্থেকে।

আমার চোখে জাতু ছিল বলেই তো তোমার চোখ স্বাতু।

'তুমি কেমনতরো ঠাকুরপো?' পিছন থেকে করবী উঠল ঝঙ্কার দিয়েঃ 'কাল রাতে এত ডাকাডাকি এত হৈচৈ আর তোমার ঘুম ভাঙল না? নিজের বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইলে?'

'কী ব্যাপার?' উদ্বেগের চেয়ে বিস্ময় বেশি আনন্দেরঃ 'নিজের বিছানা ছাড়া আর আমার আঁকড়াবার আছে কী?'

'উচিত ছিল মেঝেতে শোয়া।'

'বৃষ্টিতে, ঠাণ্ডা মেঝেতে? নিজের বিছানা ছেড়ে? কেন, এত তুর্ভাগ্য কেন?'

'মোটেই তুর্ভাগ্য নয়।' করবী বললে, 'কখনো কখনো পরোপকার করতে পারা সৌভাগ্যের কথা।'

'নিজের উপকার করতে পারি না, তায় পরোপকার!' হেসে উঠল আনন্দ। 'অর্থ দিয়ে নয় বস্ত্র দিয়ে নয়, শয্যা দিয়ে পরোপকার?'

'তা দিয়ে অন্যকে যদি সুখী করা যায় তপ্ত করা যায় তো মন্দ কি।' করবী তাকাল অদূরের বাতায়ন-বর্তিনীর দিকে। 'পীড়িতকে শয্যা দেওয়াও সেবা।'

'কে পীড়িত? কে তপ্ত হতে চায়?' ব্যাকুল হল আনন্দ। 'কী হয়েছে যদি খুলে বলো।'

করবী বলল। 'পাশের বাড়ির সাব-ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা কাল রাত্রে এসেছেন কলকাতা থেকে, বাস-এ করে। পথে ধুন্ধুমার বৃষ্টি। বিছানা-টিছানা যা কিছু ছিল বাস-এর মাথায়, ভিজে একসা হয়ে গিয়েছে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন যদি শুকনো উদ্বৃত্ত কিছু পান। তা, যেমন নেবানো সকলের লণ্ঠন, ভিতরেও

তেমনি ঠন-ঠন। আলো জ্বেলে সাড়া দিল না কেউ। যদি কেউ বা দিল, লজ্জালু কণ্ঠে জানাল অক্ষমতা।

এ সাহায্য কি সোজা কথা? আর থাকলেই বা নেয় কি করে? বয়ে নিয়ে যেতেই তো আবার ভিজে যাবে। বিছানা বইতে তখন আবার গাড়ি দরকার। এত রাত্রে গাড়ি কোথায়? গাড়ি বলতে তো সাইকেল রিক্সা। তা ডেকে আনতে আবার সাইকেল। রিক্সার ডিপো কি এখানে? তাই সর্বপ্রথমে সাইকেল খোঁজো। আর সাইকেল যে চাপবে তার একটা টুপি-সমেত ওয়াটারপ্রুফ দরকার। সুতরাং শোয়ার আশায় আজ জলাঞ্জলি। তা ছাড়া এত বৃষ্টিতে পরের বাড়িতে এসে বিছানা চাওয়াও কেমনতর।

'পুরোপুরি বিছানা কি আর চেয়েছে!' আনন্দ অজানতেই বিপন্নদের পক্ষ নিল। 'একটা শতরঞ্জি, চাদর বা মশারি এমনিধারাই কিছু চেয়েছিল নিশ্চয়। তা বাবা জেগেছিলেন?'

'জেগেছিলেন বই কি।'

'তিনি কী বললেন?' উৎসুক চোখে তাকাল আনন্দ।

'বললেন বিছানা কী করে দিই? পূজনীয় মানী ব্যক্তি, এঁদের কি ব্যবহৃত বিছানা দেওয়া যায়? নতুন কিছু থাকত, তোলা কিছু থাকত, দিতে পারতাম স্বচ্ছন্দে।'

'দিতে পারেন নি যখন তখন নিশ্চয়ই ঘুমোতেও পারেন নি।'

'না, সারারাত না ঘুমিয়ে বসেছিলেন বিছানায়। যে উপকার চেয়েছিল তার প্রার্থনা পূরণ করতে পারলেন না তারই প্রায়শ্চিত্ত করলেন বোধ হয়।'

'বোধ হয় ডেকেছিলেন আমাকে?'

'উনি কী করে ডাকেন।'

'তবে কে ডেকেছিল? মেজদা?'

ম্লান একটু হাসল করবী। বললে, 'না, আমি ডেকেছিলাম।'

'তুমি? তোমার তো মিহি কণ্ঠ। মিহি কণ্ঠও বেশি, তোমার তো চিঁহি কণ্ঠ—বন্ধ দরজা আর ঘুমন্ত কান দুটো এক সঙ্গে ভেদ করবে এমন তার শক্তি কই?'

'ভাবলাম যারা চেয়েছে চাইতে পেরেছে তারা নিশ্চয়ই টাটকা-বাসির বিচার করে নি, এ বিছানা কার, গুরুজনের, না, লঘুজনের ব্যবহার করা, না, না-করা—তারা পেলেই খুশি। সেই দিক থেকে, ভাবলাম, তোমার কোনো সংকোচ থাকবে না. তুমি দিয়ে দেবে।' শীর্ণ রেখায় আবার হাসল করবা। 'তা তুমি কী আর ওঠো! একটা সুস্থ সমর্থ মানুষ দিব্যি পড়ে পড়ে ঘুমুলে আর ওদের বাড়ির ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে-শিশু সারারাত ধুলোয় গড়াগড়ি দিল।'

'তা তুমি বাবা কি মেজদাকে দিয়ে ডাকালে না কেন?' প্রায় তিরস্কার করে উঠল আনন্দ: 'ওরা একেবারে ডাকাত-পড়া রব তুলতে পারত। চাই কি লাথি মেরে দরজা ভেঙে ঢুকতে পারত ঘরে। চাই কি কেড়ে নিয়ে যেতে পারত বিছানা। তা ওদের না ডাকলে, তুমি নিজের কণ্ঠস্বরে নির্ভর না করে বাইরে থেকে শেকলটা নেড়ে দিলে না কেন? হাত যায় না অদ্দূর?'

'আহা, তাই বুঝি?' করবীও চোখে ভর্ৎসনা পুরল। বললে, 'বাবা বারণ করলেন তুলতে। বললেন, ঘুমুচ্ছে, ঘুমুক।'

কানে ঠিক শুনছে আনন্দ, না, কালা হয়ে গেছে?

'আমি বললাম, ঠাকুরপো নিজের বিছানা দেবে কেন, দেখবে কোত্থেকে কিছু যোগাড় করে আনতে পারে কি না। তা বাবা বললেন, না দুপুর রাতে বৃষ্টিতে কোথায় বেরুবে!'

আহা, এ কী মায়া না দয়া! বুঝতে বাকি নেই, এ বিধায়ক

ভাগ্যের রসিকতা। একটা যদি বা পরোপকার করবার আশ্চর্য সুযোগ এসেছিল তাও হরণ করে নিল।

'তা তুমি পারলে কিছু সাহায্য করতে?' আনন্দ জিগগেস করলে।

'ছেঁড়া চট আর ন্যাতা কাতা তো দিতে পারি না। ছেলে-মেয়েগুলির কার মাথা থেকে কোন্ বালিশ কাড়ব, আর তোমার মেজদার তো একটাও কম পড়লে চলবে না—মাথায় তিনটে, দু পাশে দুটো—'

'শয়নে পদ্মনাভ শুনেছি, মেজদা শয়নে পার্শ্বনাথ। তাঁর দুই পার্শ্বে দুই বালিশ চাই।' করবী আবার একটা অন্য মানে করতে পারে তাই তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল আনন্দ: 'বাবা এখন কোথায়?'

'গেছেন ও বাড়িতে।' সংসারের খেদমতে চলে গেল করবী।

এখনো দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। তাই চেহারাটা রাগ-রাগ, চুল গুলি রুখু-রুখু, শাড়িটা খসা-ধসা। রাত্রে ঘুম হয় নি এক ছিটে। শরীরের যেটুকু যখন খোলা পেয়েছে মশা কামড়ে আর রাখে নি। রুক্ষতা আর বিরক্তির টানা-পোড়েনে মেজাজ যা তৈরি করে রেখেছে, যেন ছিলা থেকে বাণ বেরিয়ে আসবার আগেকার ধনুক। তা আনন্দ কী করবে। যদি ও চাইত তার বিছানা, স্বচ্ছন্দে, বি-নিশ্বাসে দিয়ে দিত। কিন্তু ও কি আর শুত? পুরুষের বিছানায় কি শোয়? পুরুষ সঙ্গে পাশে না থাকলেও, তার শয্যা কখনো স্পৃশ্য নয়, গ্রাহ্য নয়। ভাবলেই নাড়ী উল্‌টে আসে। তবে বলতে পারো, আতুরে নিয়মো নাস্তি। যদি হতে পারতে প্রেমাতুর, তা হলে অবশ্য শয়নেও নিয়ম থাকত না। ডুবন্ত জাহাজের ডেকেও ঘুমুনো যেত।

কিন্তু তার ঐ দলিত মর্দিত বিশীর্ণ শয্যা কি উপহারের বস্তু?

একটু ছেদ পড়েছিল বৃষ্টিতে, আবার হঠাৎ ঘনিয়ে এল। ধূসর

নীল, নীল কালো হয়ে গেল। প্রভাতও কি তার প্রকৃতি বদলাল না কি? প্রভাতই দিবসকে সূচিত করে এই নিয়ম খাটল কই? সোনার ভবিষ্যৎ ডুবে গেল বর্তমানের কালিমায়।

ত্রিদিববাবু এসে বললেন, 'তোকে একবার ডেকেছেন ডিপটি-বাবু।'

'কে ডিপটিবাবু?'

'ঐ যে এসেছেন কাল পাশের বাড়িতে। ঘন দুর্যোগের মধ্যে। আমি তোর কথা বলে দিয়ে এলাম।' বলে চলে গেলেন।

কি কথা, জানতে চাইল না আনন্দ। নিশ্চয়ই চাকরি বাকরির কথা নয়। খুব সম্ভব তার গুণপণার কথা, সে যে অকর্মণ্য, অপদার্থ, তারই চরিতামৃত। কিংবা কে জানে, কিছু একটা তাঁদের সুরাহা করে দিতে পারে হয় তো, তারই ক্ষুদ্র স্বীকৃতি।

বাবা না বলে এলেও সে যেত।

ঝম ঝম ঝম নতুন করে বৃষ্টি নামল অঝোরে।

কী কর্দম-কদর্য, এ সময়ে কি বৃষ্টি নামে? নিজের মনে নিজেই হাসল আনন্দ। রাতে বৃষ্টি কত মিষ্টি ছিল, এখন রিষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গটি আবার অনুকূল হলে কেমন সঙ্গত দেখাবে তাকে। ও বাড়িতে যাবার পর যদি নামত আর সেই কারণে যদি ওখানে বেশিক্ষণ আটকা থাকত তাহলে এত অভিশপ্ত মনে হত না। আর কোনো কৌশলে যদি দুই বাতায়ন এক হয়ে যেত, তা হলে বৃষ্টি তো মধুমত্তম। বৃষ্টির মত জিনিস নেই। বৃষ্টিই তখন বিরাটের বার্তা।

কিন্তু যাই কী করে?

আর, হ্যাঁ, এখুনি যাওয়া দরকার। বৃষ্টি থামলে পরে যাব হিসেবী মতলববাজের মত, তার কোনো মানেই হয় না। দেরি করতে গেলে কত কিছু চলে যেতে পারে। সোনার সুযোগের ট্রেন ছেড়ে দিতে

পারে। বন্ধ হতে পারে মন্দিরের দরজা। ক্ষণকালের বৃন্তে যে ভঙ্গুর ভঙ্গিমাটি জেগেছে তা যেতে পারে মিলিয়ে। বৃষ্টি আসে, থামে, আসে। কিন্তু ডাক দুবার আসে না।

কিন্তু তুমুল বর্ষণ যে। এরই মধ্যে যেতে পারলে তার হঠকারী যৌবনের দৃপ্ততা তুষ্ট হয় বটে কিন্তু আপাদমস্তক ভিজে যায়। ভিজে গেলে বেশিক্ষণ ও বাড়িতে লেগে থাকার ওজুহাত থাকে না। মামলার চকিতে নিষ্পত্তি হয়ে যায় তা হলে। মামলা মিটে গেলে আর থাকল কী !

আলমারির পাশ থেকে ছাতাটা টেনে নিল আনন্দ।

কবে শেষ ব্যবহার করেছে মনে করতে পারল না। রোদ, রোদকে তো কোনো দিনই আড়াল করেনি। আর বৃষ্টি ? বৃষ্টিতে কী করেছে ? হায়, বাস-এ ট্রাম-এ ঘুরেছে, যতক্ষণ না জল থামে বা গাড়ি থামে, নয়তো দাঁড়িয়েছে গাড়িবারান্দার নিচে কিংবা অন্য কোনো আশ্রয়ে, নয়তো বেরোয়নি হস্টেল ছেড়ে। কোনো একটা জরুরি কাজ, মরণ-বাঁচন জরুরি, অথচ বৃষ্টি, এমন একটা অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে আগে, ভাবতেই পারে না। ইচ্ছায় বাধা পড়ার দরুন কাজে বিরত হয়েছে বা কাজে অপটু বলে ইচ্ছা স্থগিত রয়েছে এ কল্পনার বাইরে।

অনেক ধস্তাধস্তি করে খুললে ছাতাটা। খুলতেই ছাতায় হাত না দিয়ে মাথায় হাত দিল আনন্দ। কোণগুলো খসা, শিকগুলো ভাঙা, মাঝখানটা ইঁদুরের ভোজ।

তাকাল ওদিকের জানলায়। আশ্চর্য, মেয়েটা এখনো আছে দাঁড়িয়ে। ছাতা দেখে যাবে বলে ঠিক করেছে। সংসারে এত দৃশ্য আছে তাতে চোখ ভরছে না, ছাতার মত দেখবার যেন আর কিছু নেই। কেমন মেঘের ছাতা মেলেছে আকাশে তা ছাখ, কেমন লক্ষ হাজার ফুটো হয়ে বর্ষণ হচ্ছে তাকে নিয়ে বিদ্রূপ কর, এ হতদরিদ্র পঙ্গু

ছাতাটাকে নিয়ে কেন? যার মেরুদণ্ড দুর্বল, নির্ভর করবার যার মুরুব্বি নেই, মাথায় যার সর্বনাশ, তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করাই তো সোজা। গরিবকে যন্ত্রণা দিতে তো আর ট্যাক্সো লাগে না।

চোখোচোখি হতেই সুষীমা হেসে ফেলল।

এ কী! এ তো বিদ্রূপের হাসি নয়। এ অভিনন্দনের হাসি।

ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলে বৃষ্টির মধ্যেই ঝাঁপ দিল আনন্দ। এক ছুটে ও-বাড়ি।

দুই

'এ কি, আহাহা, ভিজে গেল একেবারে।' বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বাইরের ঘরে চেয়ারে বসেছিল সুধীন, উঠে দাঁড়াল।

'না, ও কিছু না।' মাথার একরাশ ঘন চুলে হাতের এক বাড়ি মেরে সমস্ত বৃষ্টিটা যেন ঝেড়ে ফেলে দিল আনন্দ।

'তুমিই বুঝি আনন্দ?' সুধীন জিগ্‌গেস করল।

ঝকঝকে সাদা দাঁত মেলে আনন্দ হাসল। বাবা বুঝি সব বলে গেছেন আমার কীর্তিকলাপ।

যেখানেই যাবে সেখানেই বলবে। কত বাপ আছে নিজের প্রশংসা করতে লজ্জায় বাধে বলে পাকেপ্রকারে ছেলেদের প্রশংসা করে। অন্তত ছেলেদেরকে কে কী প্রশংসা করেছে তার ফিরিস্তি দেয়। কে কী সামান্য পড়ে অসামান্য ফল করেছে পরীক্ষায়, কাকে কোন্ সাহেব সেধে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরি দিল, কে কোথায় কী বক্তৃতা দিয়ে ভি-আই-পিদের বাহবা কুড়োল, কে কোথায় ইণ্টারভিয়ুতে তাক লাগিয়ে দিল কমিশনকে, যদিও চাকরিটি হয়নি। কিন্তু

ত্রিদিববাবুর উল্‌টো। রাস্তা থেকে লোক ধরে নিয়ে এসে ছেলেদের নিন্দা করবেন। একটাও মানুষ হল না মশাই, মনের মত হল না। তৃতীয়টা ভেবেছিলাম চটকদার কিছু হবে, তা শুধু ম্যাড়ম্যাড় করছে। ঢাক তো নয়, হতে চলেছে ট্যামটেমি।

'আপনি ?' চিনতে পারেনি সুধীন।

ত্রিদিববাবু হাসলেন। দেশ স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত সরকারী চাকুরেরা ওঁর বাড়িতেই আড্ডা দিয়েছেন। উনিই একমাত্র নিরাপদ নন-অফিসিয়্যাল ছিলেন—পোস্টমাস্টার। হেডমাস্টারও তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক ব্র্যাকেটে, কিন্তু হেডমাস্টার মাত্রই একটু নীরস-নিকষ, তাই ওঁর সংসর্গে বেশি আরাম পেত না চাকুরেরা। আমার ওখানেই আড্ডা দিত, আঁতের কথা কইতো দুটো মন খুলে। আর আমি থাকিয়ে বাসিন্দে, জনে-বলে-উপায়ে সাধ্যমত সকলের উপকার করতাম। কার কী দরকার, চাল-চিনি থেকে শুরু করে টিন-সিমেণ্ট, কখনো ব্ল্যাক থেকে কখনো রেড থেকে যোগাড় করে এনে দিতাম। এখন দেশ স্বাধীন হবার পর কেউ আর বিশেষ পোঁছে না। মুখের ট্যাক্সো উঠে গিয়েছে, যার যা খুশি ধুমুল দিচ্ছে, আড়াল লাগছে না, আর কিছু বলতে যান, বলবে দাদার রাজ্যে আছি। দেখা হলে দুটো মিষ্টি কথা বলা, এ-বাড়ি ও-বাড়ি ভাবসাব করে থাকা, এ সব উঠে গেছে। আর মতলোব নেই অথচ পরোপকার, এ তো মশাই অমাবস্যার চাঁদ। তবু অভ্যাসবশে আসি খোঁজখবর করতে। কাল রাত্রে খুব বিপন্ন অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছেন, নতুন লোক, যদি আসি কিছু উপকারে, তাই ভোর হতেই এসেছি খোঁজ করতে—

এমনটি কই শুনিনি কখনো। সুধীন জিগগেস করলে, 'পাশেই থাকেন বুঝি ?'

'ঐ তো। আমার বাড়ি আপনার বাড়ি এক বুকের দুই পাঁজর।'

'করেছেন ?'

'না, কিনেছি। রিটায়ার করার পর যা পেয়েছি কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ঐ বাড়িখানা হয়েছে।' পরের খবর কী নেবেন, নিজের খবর দিতেই ব্যস্ত ত্রিদিববাবু: 'এখানে পোস্টাপিসের সঙ্গে কোয়ার্টার ছিল না, ঐ বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবেই ছিলাম বরাবর। সৎ সঙ্গে থাকব, উচ্চ সঙ্গে, তাই উকিল-মোক্তারদের পাড়ায় না গিয়ে, সরকারী পাড়ারই বাসাড়ে হলাম। এক পালকের না হই এক গাছেরই তো পাখি আমরা। রঙ-ঢঙ যাই হোক, আমিও তো সরকারী—'

'এবং সবচেয়ে দরকারী।'

'তা আর কে বোঝে ? কাজ নেই সাজ নেই, লোকে ফিরেও তাকায় না। ভেবেছিলাম হাতের স্ট্যাম্প-শীল গেছে, যাক, কপালে রাজটীকা পরব। ছেলেদের দিয়ে মুখ উজ্জ্বল হবে। আশা আর বাসা দুইই বড় করেছিলাম, কিন্তু ঐ যে বলে, 'কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কী !'

'ক ছেলে আপনার ?'

'সেদিক থেকে দশরথ ছিলাম মশাই, চার-চার ছেলে, কিন্তু আমার অদৃষ্টে তো রামের বনবাস নয়, দশরথের বনবাস।'

'বড় ছেলে কী করে ?' এত ভূমিকার পর মুল গ্রন্থে না প্রবেশ করে উপায় কী সুধীনের ?

'সে বড় চাকরিই করে, কিন্তু থাকে বাঙলা দেশের বাইরে, কানপুরে। দেশে-ঢেঁশে আর ফেরে না, এদিক ওদিক টুর-টহল করে বেড়ায়। সংসারী করাতে পারলাম না, তাই হবেই তো, ঘর-বিবাগী'—

'সংসারী করাতে পারলেন না কেন ?'

'কী করে পারব ! ওর মা থাকত, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেন

নিশ্চয়ই। আমি তো এখন বেয়ারিং হয়ে গিয়েছি। আমার কথা কে শোনে।'

কোথায় সত্যিকার হাহাকার বুঝল যেন সুধীন। বললে, 'সাহায্য করে না আপনাকে ?'

'আমাকে ? এক পয়সাও না। ঐ তৃতীয়টাকে পাঠায় একটা বরাদ্দ টাকা। তা যাই বলুন, পাঠায় ঠিক মাস-মাস, এক চুল এদিক-ওদিক নেই।' ত্রিদিববাবু বড় ছেলেকে প্রশংসাই করছেন। 'মাস-মাস পাঠিয়েই চলেছে। কিন্তু ভাই পাশ করল না ফেল করল ; এখনো আছে কলেজে, থাকলে কতদিন আছে, না, বেরিয়ে গেল, না ছেড়ে দিল কোনো খোঁজ নেই। কোনো উপলক্ষে বেশি চাইলেও হুঁশ নেই, কোনো কারণে কম লাগবে কিনা তারও কৌতূহল নেই। মনি-অর্ডারের কুপনে একছত্র কিছু লেখে না মশাই—'

'ঐ তো তাহলে আপনাকেই সাহায্য করছে।'

'কিন্তু টাকাটা যে আসে ঐ তৃতীয়টার নামে।'

'তৃতীয় ছেলের নাম কী ?'

'নামের বাহার আছে। এদিকে দুঃখক্লেশ কষ্ট সন্তাপ দুর্দশা দুর্গতি অভাবের পিরামিড—কিন্তু নাম একেবারে আহ্লাদে আটখানা। নাম হচ্ছেন তার আনন্দ।'

সুধীন হেসে ফেলল। 'তা নাম তো আর ও রাখেনি, আপনি রেখেছেন।'

'ওর মা রেখেছে। বড় ছেলের নাম হরিপদ, মেজর নাম কালীপদ, ওর মা কিছুতেই আর তারাপদ বলতে দিলে না। বললে, ও আমার আনন্দ। ও আমার আনন্দের আলো। এখন বেঁচে থাকলে টের পেতেন কেমন আলো ছড়াচ্ছেন দিকে-দিকে—'

'পড়ছে না ?'

ছোট করে প্রশ্ন করলে কী হবে, ত্রিদিববাবু সংক্ষেপ হতে জানেন না। বললেন, 'পড়ছে বৈ কি, কেবলই পড়ছে, পড়েই চলেছে। জানে পড়া শেষ করলে টাকা পাঠানো বন্ধ হবে। আর বন্ধ না হলেও ওটা তখন আসবে হয়তো আমার নামে। তাই বুঝছেন না—পড়াটাই চাকরি, মাসোহারাই মাইনে!'

বাধা দিল সুধীন। 'কত টাকা?'

'পঞ্চাশ।'

'পঞ্চাশ টাকায় কী হয়? থাকে কোথায়?'

'কলকাতায়। হস্টেলে।'

'পড়ে কী?'

'শুনবেন না মশাই, বসে পড়বেন।' ত্রিদিববাবু মুখের এমন ভাব করলেন যেন নিজেই বসে পড়েছেন। বললেন, ল' পড়ে। শুনছেন মশাই আজকালকার দিনে র ছাড়া কেউ ল পড়ে?'

'কেন, ল তো ভালোই।' নিজে উকিল থেকে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে, ল-কে লজ্জা দেয় কী করে?

'ল পড়বি তো লঙ্কায় যা।' অজানতেই মুখ কোঁচকালেন ত্রিদিববাবু। 'বলে কিনা ব্যারিস্টার হব! কী হবি তা তো জানি। একটা বেঁটে পেন্টালুন পরে ছাতার কাপড়ের কালো কোট গায়ে দিয়ে শেয়ালদা-আলিপুর করবি, আর টাউটের পিছে ছুটবি—বলে কি না ব্যারিস্টার—'

'টাউট সক্কলের। বাজারে বসলেই টাউট। লাল হতে হলেই দালাল চাই।' সুধীন আনন্দের পথ নিয়ে বসল: 'তা আপনার ছেলে খারাপ বলেছে কি, উচ্চাভিলাষ তো ভালো—'

'এটা অভিলাষ?' ত্রিদিববাবু চেয়ারের হাতল দুটো দুহাতে একসঙ্গে চেপে ধরলেন: 'এটা কিছু না করার অভিসন্ধি। কত বললাম,

এম-এটা পড় সঙ্গে, তা নয়—তাতে যে পরিশ্রম লাগে, গায়ে ফুঁ দিয়ে চলা যায় না—তাতে রাজী নয়—'

'এম-এ পড়তে তো টাকাও লাগে বাড়তি। আপনি দিতেন নিশ্চয়।'

'আমি কোত্থেকে দেব ? কমিউট করার পর যা সামান্য পাই তা কহতব্য নয়। তুই একটা খাটিয়ে-পিটিয়ে মর্দ ছেলে, তুই একটা কিছু যোগাড় করে পড়, পড়ার খরচ চালা। কত লোকে কলকাতায় খুচরো-খাচরা পার্টটাইম হাফটাইম চাকরি করে পড়ছে—অন্তত টিউশানি করছে দু বেলা, আর তোর ষোলকড়াই কাণা—ষাঁড়ের গোবর, লজঝর ল নিয়ে পড়ে আছিস—'

'আপনার মেজ ছেলে কী করে ? ও কিছু পারে না পাঠাতে ?' ইচ্ছে করেই খোঁচা মারল সুধীন।

'মেজ ছেলে ? কালীপদ ?' বুকভাঙা মুখ করলেন ত্রিদিববাবু। 'ও কোঅপারেট করতে-করতেই গেল। ও টাকা পাঠাবে ?'

'কোঅপারেট মানে ?'

'কো-অপারেটিভে চাকরি করে ! জীবনে দুই জিনিস সার বুঝেছে, এক চাকরি আরেক স্ত্রী। যার ফলে সংসারে টাকা কম আর সন্তান বেশি।'

হাসল সুধীন। বললে, 'টাকা কম মানে ? মাইনে ভালো নয় ?'

'তা বলা যায় ভদ্রলোককে। কিন্তু বললে কী হবে ? একটা করে হচ্ছে আর ইনসিওরেন্স বাড়াচ্ছে, প্রফিডেণ্ড ফাণ্ড বাড়াচ্ছে। মানে ভবিষ্যৎ পাকা করছে। এদিকে বর্তমান ছত্রখান। কী সুন্দর পলিসি মশাই। এখন তুমি শুকিয়ে মরো ভবিষ্যতে মোটা হবে বলে।'

'তবে সংসার তো এখন কালীপদর। আপনার ঝক্কি কী ?'

'বাঁচতে গেলেই ঝক্কি। ছোট ছেলে, চতুর্থ ছেলে, নাবালক ছেলেটা আছে না ?'

'তার নাম কী ?'

'তার নাম বিষাদ।'

'আপনি রেখেছেন বুঝি ?' ম্লান একটু হাসল সুধীন।

'কেন রাখব না শুনি ? ওর অন্নপ্রাশনের দিন ওর মা মারা গেল। ও ছাড়া কি ওর অন্য নাম হয় ? হতে পারে ?'

'করে কী ?'

'ইস্কুলে পড়ে। আর কালীপদর ফরমাশ খাটে।' ত্রিদিববাবুর মুখ করুণ হয়ে উঠল : 'একটা বড় ভাই একটা ছোট ভাইকে কী পরিমাণ খাটাতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আগের দিনে ক্রীতদাসকেও বোধ হয় এমন খাটাত না তার প্রভু—'

'প্রভু তো আপনি। আপনার বাড়ি। আপনার জোর। আপনি বাধা দেবেন।'

'সব জোর জুড়িয়ে গেছে আনন্দর মা মারা যাবার পর। বড় শখ ছিল একটা ছেলে এম-এ হয়, বিদ্বান হয়—'

'ল বুঝি বিদ্যা নয় ?'

'বিদ্যা, কচকচি বিদ্যা। আর যা ধরা না পড়লে বড় বিদ্যা সেই বিদ্যা।'

সুধীন এখন আর উকিল নয়, লয়িয়ার ম্যাজিস্ট্রেট। তাই গায়ে লাগছে না ধুলোবালি। বললে, 'অর্থের কাছে বিদ্যা কী। বিদ্যা জোনাকি অর্থই চাঁদ।'

'কী যে বলেন ! অর্থ কি তৃপ্তি ? বিদ্যাই তৃপ্তি। আর ওকালতিতেই বা পয়সা কই আজকাল ?'

'ওকালতিতেই তো পয়সা। ডাক্তারও অত পায় না যত উকিলে পায়।' সুধীন বলতে লাগল : 'ডাক্তারের মামলা এক কোর্টেই শেষ, উকিলের আবার আপিল আছে। শুধু একটা আপিল ? রোগের শেষ

আছে, ঋণের শেষ আছে, ঝগড়ার শেষ নেই। আর ঝগড়া মানেই উকিল। তাই দেখছেন আর সকলে রিটায়ার করে, উকিল করে না। তার একেবারে মরণ কামড়। মানে মরণ পর্যন্ত কামড়।'

'রাখুন মশাই, অমন পয়মন্ত কয় জন?' ত্রিদিববাবু ঝলসে উঠলেন: এমনিতে বলুন না উকিল, শুনতেই মনে হবে ছন্নছাড়া, অনাথ, বিয়ের বাজারে পাত্রী পাওয়া দুর্ঘট। কোনো গুডউইল নেই, মার্কেট ভ্যালু নেই। সেই উকিল হবার সাধ আমার তৃতীয় তনয়ের—'

'ভালো সাধ। দেখবেন খুব শাইন করবে। দাঁড়াতে টাকা, বসতে টাকা, পাশ ফিরতে টাকা। কাগজ দেখেছে টাকা, ধরেছে টাকা, পড়েছে টাকা, একেকটা সই একেকটা সোনার ডিমপাড়া হাঁস। আমার দিকে তাকাচ্ছেন?' হাসল সুধীন: 'সব উকিলই ম্যাজিস্ট্রেট হয় না, কোনো-কোনো ম্যাজিস্ট্রেটও উকিল হয়।'

'ওকালতি মানেই লম্বা দৌড়ের বাজি।' অনুতাপের সুর বার করলেন ত্রিদিববাবু, 'অত ধৈর্য ধরার সময় কোথায়? এত পার্টস্ ছিল ছেলেটার, এমনিতে এত পপুলার এত পরোপকারী—'

বাপের মতনই পরোপকারী নাকি? এতক্ষণ পরের ত্রাণ করতে এসে সপরিবার নিজের কাহিনীই উদ্গীরণ করছে। কানের পোকা বার করা ছাড়া আর কী উপকার হচ্ছে পরের—মধুসূদন জানেন।

'কী রকম উপকার? শুধু কথায় না কাজেও?' একটু বোধ হয় বিদ্রূপের আভাস এল প্রশ্নে, তাই একটু স্নিগ্ধ হবার চেষ্টা করল সুধীন: 'মানে, শুধু মনই ভেজায় না, চিড়েও ভেজায়?'

'বলেন কী! সমস্ত শহর-গাঁ ইস্কুল-কলেজ ব্যবসা-বাণিজ্য আড্ডা-আখড়া ক্লাব-মজলিশ চেনে তাকে এক ডাকে। সকলের বিপদে-আপদে পড়বে আগুন-ঝাঁপা হয়ে। তাই একেক সময় মনে হয় শ্রীগুরুর ইচ্ছেয়'—কপালে হাত ঠেকালেন ত্রিদিববাবু: 'উকিলই

না হয় শেষ পর্যন্ত। উকিল হয়ে না ইলেকশানে দাঁড়ায়। উকিল মানেই তো পাবলিক ম্যান। কিন্তু যদি দাঁড়ায়, বুঝলেন কিনা', ত্রিদিববাবু নিজেই দাঁড়িয়ে পড়লেন: 'নির্ঘাত রিটার্নড্ হবে। ইয়ং ম্যান, চাই কি, মন্ত্রীও হয়ে যেতে পারে।'

'জেলখাটা আছে?'

'আজকাল তা লাগে না। তেলখাটা হতে পারলেই হল।'

'তেলখাটা?'

'হ্যাঁ, তেল মাখাবার খাটনি—'

'তা হলে ছেলে আপনার একেবারে খরচের খাতায় নয়।' সুধীনও উঠে দাঁড়াল। 'যদি সত্যি কেউ পরোপকারী হয় তার হিল্লে হবেই।'

'কিন্তু ঐ যে বললাম, ওকালতি, একটা লম্বা পাল্লার দৌড় নিয়েছে, কদ্দিনে দড়ি ধরতে পারবে কে জানে! একটু ত্বরা নেই, বেগ নেই, উৎসাহও নেই। ঢিমে আঁচের উনুন জ্বলছে। গনগন করে জ্বল্, একটা কিছু ধর শিষ বাড়িয়ে। ল-ফ ছেড়ে এম-এ দে, টপ করে পাশ করে ঝপ করে একটা চাকরি বাগিয়ে নে। তা না, চলছে যেন গদাই লস্কর। গড়িয়ে-গড়িয়ে, স্টিম-ফিম নেই, গাধাবোটের মত লগি মেরে। তা কার দোষ দেব! যেমন আমি গাছ তার তেমনি তেউড়।'

'বলেন কি, আপনার গুণই তো পেয়েছে আপনার ছেলে। আপনার জনপ্রিয়তা, আপনার পরসেবা'— দ্বিতীয় কথাটা কি সুধীনের জিভে আড়ষ্ট শোনাল?

'আমার আর কী গুণ আছে?' দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন, ফিরলেন ত্রিদিববাবু। বললেন, 'পরসেবা! আর কি সে সামর্থ্য আছে, না দাবরাব আছে? নইলে চোওদার সাহেবকে নতুন লেপ-তোশক সেদিন দিয়ে দিয়েছিলাম না?'

'কী ব্যাপার?'

'জেলা থেকে চোঙদার এসেছে ইনস্পেকশানে। ডাকবাংলোয় রিসিভ করতে গেছি। ওরকম আমি যাই। শাস্ত্র বলেছে, গুণীকে প্রণাম না জানানো পাপ। গিয়ে দেখি আর্দালিকে দোহাত্তা মারছে সাহেব। বিষয় কী? বিছানা বেঁধে এনেছে আর্দালি, শুধু শতরঞ্জি, চাদর আর বালিশ, আসল বস্তু লেপ তোশকই নেই। মেরেই ফেলে বুঝি। কিন্তু কী আশ্চর্য, আর্দালিটা কাঁদছেও না, প্রতিবাদও করছে না। মার যে স্রেফ অভিনয় তখন কী আর ছাই বুঝেছি! নতুন বিয়ে হয়েছে মেয়ের, জামাইসহ আসছে প্রবাস থেকে, নতুন লেপ-তোশক করেছি, তাই দিয়ে এলাম ডাকবাংলোয়। সাহেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাক ঘুমিয়ে বাঁচব। কিন্তু তিনি তো শুধু ঘুমিয়ে বাঁচেন নি, ঘুচিয়ে বেঁচেছেন--'

'তার মানে?'

'নির্দিষ্ট সময়ে বিকেলে সি-অফ করতে গিয়ে দেখি সকালেই চলে গিয়েছেন।'

'বিছানা?'

'এবারও আর্দালি ভুল করেছে। ভুলে বেঁধে নিয়ে গেছে—'

ভিতর থেকে সুব্রতা হেসে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সুষীমা।

'সেই থেকে বুঝি আর কাউকে বিছানা দিয়ে সাহায্য করেন না?'

'সেই নতুন লেপ-তোশকের দিন আর কই?' মেয়েটা কই?' ত্রিদিববাবুর চোখ ছলছল করে উঠল। 'মেয়েটা থাকলে বুঝত বাপের দুঃখ। ছেলেরা কেউ নয় মশাই, বাপের দুঃখ বুঝতে মেয়ে। সেই মেয়েই যখন নেই—' মুখ লুকোলেন ত্রিদিববাবু।

সুষীমা ঘরে ঢুকল।

'এই বুঝি আপনার মেয়ে? বা, লক্ষ্মীশ্রী। ঠিক আমার নন্দিনীর মত। আনন্দের পরেই নন্দিনী।'

সুষীমা প্রণাম করল।

'পড়ছ ? কী পড়ছ ?'

'আই-এ পাশ করেছি।'

'আহা শুনতেই প্রাণ ঠাণ্ডা। শ্রীর উপরে আবার বিদ্বে। সোনার উপরে মিনের কাজ।' তাকালেন সুধীনের দিকে। 'এই দেখুন ক'দিন পরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন, তার বেকারি ঘুচে যাবে, আপনার থাকবে না আর দায়িত্ব। কিন্তু ছেলের বেকারি কতদিনে ঘুচবে ব্রহ্মা-বিষ্ণুও বলতে পারবে না পুঁথি ঘেঁটে। আর যতদিন সে অকর্মা ততদিনই সে আপনার পুষ্যি। তাই আজকাল মেয়ে তো ঘাড়ে পড়ে নেই, ছেলেই ঘাড়ে পড়ে আছে —'

'কিন্তু মেয়ে যদি অপাত্রে পড়ে ?' সুধীন অলক্ষ্যে তাকাল সুষীমার দিকে।

'তাহলে দুঃখের অবধি নেই। ছেলে একটা না খেয়ে আছে সহ্য হয় কিন্তু মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে খেতে পাচ্ছে না এ অসহ্য।' আবার দরজার দিকে এগোলেন ত্রিদিববাবুঃ 'যাই, কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, আনন্দকে পাঠিয়ে দিই। আপনাদের গোটাকয় শতরঞ্জি আর চাদর আর মশারি—যা যা লাগে ওকে বলবেন, ও সব যোগাড় করে দিতে পারবে। আপনি ডিরেক্ট লাইনের অফিসর নন কিনা—আমলা-ফয়লারা তেমন এসে জোটেনি হয়তো, যাই, বলি তো আনন্দকে—'

এ কী, একটা ছাতা নেই সঙ্গে ? বাতাসের ঝটকার মত ঢুকে পড়ল আনন্দ।

বলাকওয়া নেই, নিচু হয়ে প্রণাম করল সুধীনকে।

আনন্দ জানে বয়োজ্যেষ্ঠদের খুশি করা কত সহজ। ঘরে এসে পড়লে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াও, হাতের সিগারেটটা লুকোও, নয়

তো ছুঁড়ে ফেলে দাও বাইরে। নয় তো টিপ করে একটা প্রণাম করো। ব্যস, খাসা ছেলে, সোনার টুকরো ছেলে।

যথারীতি গলে গেল সুধীন। সুষীমা এমনিতেই চলে যাচ্ছিল, সুধীন তাকে লক্ষ্য করে বললে, 'যা, একটা তোয়ালে নিয়ে আয়।'

তাড়িয়ে দিল নাকি? না, ফিরে আসতে বলেছে। ভালো করে কথাটা শোনেনি বুঝি। না, শুনেছে, তোয়ালে আনতে বলেছে। মাথার জল তোলা থাক মাথায়। তোয়ালে আসুক। তোয়ালে আনুক। নিশ্চয়ই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দেবে। দেবে তো মাথায় তুলে নেব।

এখন বলো তো, তোয়ালে পাই কোথায়? থাকলেও কি আর শুকনো আছে? শাড়ির আঁচলটা এগিয়ে দিলে কেমন হয়?

'ঐ গামছাটা দে না।' সুব্রতা বললে।

সুষীমা বললে, 'আমি পারব না, তুমি দিয়ে এস।'

সুব্রতা গামছা নিয়ে এল। বললে, 'এই নাও, মাথাটা অন্তত মুছে ফেল।'

ছন্দ রেখে আনন্দ প্রণাম করল সুব্রতাকে। বললে, 'না, না, লাগবে না।' কোঁচার খুঁটে মুছতে লাগল মাথা। 'বলুন কি কি লাগবে? জলের ড্রাম পেয়েছেন? ভারী যোগাড় হয়েছে?'

'এখন আর জলের কথা ভিজের কথা বোলো না। এখন শুকনো কথা বলো, খরার কথা।' নিজেই হাসল সুব্রতা।

'তার মানে এখন কঠিন কথা বলো, নিষ্ঠুর কথা বলো।' টিপ্পনী কাটল সুধীন।

'অন্তত নিষ্ঠুর ব্যবহার করো।' ভিতরের দরজার দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করল আনন্দ। সেটাকে তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলবার জন্যে সুব্রতার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু মা, আপনাদের কাছে মন যে আপনাতেই ভিজে ওঠে—'

আর যায় কোথা। মা বলেছে।

অন্তর্হিতা সুষীমাকে লক্ষ্য করল সুধীন। 'ওরে চা করে আন।'

কুণ্ঠিত হবার ভাব করল আনন্দ। 'কি আশ্চর্য, আমার সেবা আগে কেন? আপনাদের কি কি দরকার তার আগে লিস্টি করুন।'

'কটা শতরঞ্জি বালিশ চাদর মশারি, সমূহ এই বিশেষ দরকার।' বৃষ্টির দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে বললে সুব্রতা।

'কিন্তু শোবেন যে তক্তপোশ কই? তক্তপোশ আছে?'

'ফার্নিচার সব আসবে লরিতে।' সুধীন বললে।

'তক্তপোশ ফার্নিচার নয়, ও বেডিং। দাঁড়ান, কখানা লাগবে?' চাঞ্চল্যে জ্বলতে লাগল আনন্দ: 'কিছু ভাববেন না, বাজারপটিতে মাড়োয়ারীরা আছে, আমার সঙ্গে আলাপ আছে ওদের, আমি বললেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। এ বাড়ির ঘরগুলি কত বড়? কী মাপের তক্তপোশ লাগবে? একবার দেখতে হয়—'

কে কাকে রোখে, আনন্দ ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে।

ভিতরের বারান্দায় একটা টেবিলের সামনে খুঁটিনাটি কী কাজ করছে সুষীমা।

'এ কি, তোয়ালে খুঁজছেন না কি?' আনন্দ এগিয়ে এল দু'পা।

এক মুহূর্ত চোখাচোখি হল। সুষীমা রাগবে ভেবেছিল কিন্তু ঝলসে না উঠে উলসে উঠল। কী সুন্দর কালো রং, কী গভীর কালো চোখ, কী উজ্জ্বল কালো চুল - চোখের প্রান্ত দুটো যেখানে মিশেছে বাইরের দিকে সেই কোণ দুটো কি উপরের দিকে একটু বাঁকানো—ও চোখে কি কোনোদিন কাজল পরেছে, নইলে চোখের কোণের নিচের রেখা অমন গাঢ় কালোয় টানা কেন? আর কী প্রস্ফুট জোরদার চেহারা। নিপুণ তীরন্দাজ যেন অব্যর্থ বাণ ছুঁড়েছে তেমনি একটা স্থিরলক্ষ্য উপস্থিতি! যেন দেখেছে, ছুঁড়েছে, বিদ্ধ করেছে।

সুষীমা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'ছাতার কাপড় খুঁজছি।'

'সে কি? ছাতা তৈরি করবেন?'

'মোটেই না। কোট তৈরি করব।'

'কোট?'

'কালো কোট।'

'কার জন্যে?'

'আপনার জন্যে।' স্পষ্ট হেসে ফেলল সুষীমা।

আশ্চর্য হাসি! দেখতে যত নয় শুনতে। হাসি থেমে গেলে হাসির রেশও যে ছোট-ছোট শব্দ তোলে এ কে দেখেছে।

'আমার জন্যে? ও বুঝেছি।' লজ্জার নয় গর্বের ভাব ফোটাল আনন্দ: 'বাবা বুঝি বলেছেন আমায় উকিল হবার বাসনার কথা?'

'সে তো একটা চিমটি দিয়ে কিল মারলেই হয়।' আগুনের কণার মত হাসির কণা ঝরতে লাগল সুষীমার চোখ থেকে। 'চিমটিতে উ আর পিঠে একটি পরিপক্ক কিল।'

'তা তো আছেই। দারিদ্র্যের চিমটি আর দুর্ভাগ্যের কিল—' ততক্ষণে সুব্রতা এসে গেছে। তাকে উদ্দেশ করল আনন্দ: 'কিন্তু বলুন না, উকিল হওয়া খারাপ?'

'না, খারাপ কেন? দেশের কত বরেণ্য পুরুষই তো উকিল। কিন্তু আমি বলছি, ঐ সঙ্গে এম-এটা পড়লে না কেন?'

পড়াখরচ চালাবার লোক নেই, বিমুখ-বিরুদ্ধ সংসার, এমনি একটা কৈফিয়ৎ দেবে আশা করেছিল সুষীমা, কিন্তু একটা কি রকম আশ্চর্য কথা বললে আনন্দ। বললে 'তার মানে আমার মধ্যে কোনো ছলনা নেই, দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা নেই, নেই কিন্তু-কিন্তুর আড়ষ্টতা। আমি দু নৌকোয় পা দিয়ে সুবিধে বুঝে এক নৌকো ছেড়ে দিই না। আমি

যখন উকিলই হব তখন এম-এটা অবান্তর আমি দ্রুত না হতে পারি কিন্তু আমি ঋজু, আমি স্থির—'

বলছে আর আলো হয়ে উঠছে আনন্দ। কথার মধ্য দিয়েই যে ব্যক্তিত্ব দীপ্তি পায় এর আগে যেন দেখেনি সুষীমা। কথাহারা চোখে তাকিয়ে রইল মুখের দিকে।

তার মনের কথাটা সুব্রতা বললে। বললে 'আজকাল তাড়াতাড়ির যুগ। কে কত আগে পৌঁছুতে পারে তারই জন্যে ছুটোছুটি—তুমিই বা কেন পিছিয়ে থাকবে? সঙ্গে এম-এটা নিলে না কেন?'

'তার মানে, বলেছি তো, আমার মধ্যে কোনো ছলনা নেই।' বললে আনন্দ, 'আমি দু' নৌকোয় পা দিয়ে এক নৌকো ছেড়ে দিই না। হচ্ছে হোক, দেখা যাক কোন দিকে হাওয়া, এমনি ধারা আমার নির্বাচন নয়। আমি আগের থেকে তৈরি। ল-ই আমার একমাত্র গন্তব্য। যার কিছু হয় না তার জন্যেই ল—এ আমার কথা নয়, যার সব হয় তার জন্যেই ল—এই আমার কথা।'

'পরের ঝগড়ার উপরে খাওয়া।' বললে সুষীমা, 'তার মানেই পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙা।'

'এ আপনি বলছেন কি।' জ্বলতে লাগল আনন্দ। 'মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। জানেন কত প্রবল দুর্বলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে, প্রতিবেশীর স্বত্বের সীমারেখা লঙ্ঘন করছে, কত নির্যাতন হচ্ছে নিরীহের উপর—তার প্রতিকারের জন্যেই তো উকিল--'

সুন্দর চোখে তাকিয়ে রইল সুষীমা।

'তার পর প্রতারণা? কত মহাজন গরিব দেনদারকে ঠকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সর্বস্ব। ব্যবসা করতে বসে কত শুষে নিচ্ছে খদ্দেরদের। কত অনাথের বিত্ত আত্মসাৎ করে নিচ্ছে আত্মীয়েরা। এ সব অন্যায়কে

রাষ্ট্র শাসন করবে কি করে যদি উকিল না থাকে ? কোন্ আইন খাটবে তার ব্যাখ্যাতাই তো উকিল ।'

'এতও আছে নাকি ?' সুষীমাকে নিরীহের মত দেখাল।

'তার পর চুক্তিভঙ্গ ?' যখন একবার আনন্দকে কথায় পেয়েছে তখন তাকে থামায় কে ? 'ধরুন আপনাকে কেউ একটা বাড়ি বেচবে বলে চুক্তিতে আবদ্ধ হল, আপনার কাছ থেকে আগাম টাকা নিল। তার পর আপনাকে কলা দেখিয়ে সেই বাড়ি অন্যকে বেশি দামে বেচে দিল। আপনি আপনার এই ক্ষতি, এই অপমান মুখ বুজে সহ্য করবেন ? মামলা করতে ছুটবেন না আদালতে ? আর গণেশের বাহন ইঁদুর, মামলার বাহন উকিল। আপনি খালি কালো কোট দেখছেন, কিন্তু এই কালোর মধ্যেই যে আছে লাল, সংগ্রামের লাল, আগুনের লাল তা দেখছেন না। যাক, আমি কেবল নিজের কথাই বলছি—'

'আপনি তো নিজের কথাই বলবেন।' চায়ের কাপ এগিয়ে দিল সুষীমা।

'কোথায় বসতে দিই ! এই মোড়াটায় বসো।' সুব্রতা এগিয়ে এল। 'জিনিসপত্র এসে পৌঁছয়নি এখনো—'

'না, না, বসতে লাগবে না। দাঁড়িয়েই খেতে পারব।'

'শুধু চা দিলি ? টিফিনকেরিয়ারে মিষ্টি নেই ?' মিষ্টির খোঁজে গেল সুব্রতা।

'নিজের কথাই বলছি মানে ?' চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে মুখের কাছে তুলেছে, থামল আনন্দ।

'নিজের কথা, নিজের আরামই তো দেখবেন আপনারা।' মাটিতে চোখ রেখে সুষীমা বললে।

'নিজের আরাম !'

'তা ছাড়া আবার কি। নইলে কাল রাতে দিব্যি নিজের বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইলেন? আর আমরা ঠাণ্ডা খালি মেঝের উপর বসে বসে রাত কাটালাম!'

কেন, কী হয়েছিল, এ সব অবান্তর প্রশ্নের ধার ঘেঁষেও গেল না আনন্দ। সারা শরীরে রক্ত হঠাৎ কুলকুল করে উঠল। বললে, 'আমাকে ডাকলেন না কেন? ঘুম ভাঙালেন না কেন আমার?'

'বেশ বলেছেন। আপনাকে যে ডাকব আপনাকে চিনি?'

'চেনেন না বুঝি?' যেন কী ভীষণ অবিশ্বাস্য এমনি চোখে তাকাল আনন্দ। 'না চিনলে বুঝি ডাকা যায় না? বিপদে পড়লে লোকে যেমন করে ডাকে তেমনি করে ডাকতেন। কিংবা একটা ঢিল ছুঁড়তে পারতেন জানলা দিয়ে- আমার জানলা তো খোলা ছিল—'

'কী বুদ্ধি!' ছেলেমানুষের মত খিলখিল করে হেসে উঠল সুষীমা। 'ঢিল পাব কোথায়? আর পেলেও বা কি, আমি কি ছুঁড়তে পারি?'

'পারেন না, না?' এও যেন অবিশ্বাস্য এমনি ভাব করল আনন্দ।

'যে ঘরের দিকে ছুঁড়ব সে ঘরে যে মূর্তিমান আপনি আছেন তা জানব কি করে?'

'জানতেন না বুঝি?'

'তা ছাড়া আমার কি তাক আছে, টিপ আছে? আর ঢিল মারলেও বা কি। আপনার ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়লেই বা কি—কী বুদ্ধি!'

'বুদ্ধিও নেই বলতে চান?'

'একটুও নেই। ঢিল একটা পড়লেই কি আর ঘুম ভাঙে! আর ঘুম ভাঙলেই বা কি, উঠতেন আপনি?'

'নিশ্চয়ই উঠতাম। লাফিয়ে উঠতাম।'

'না, না, ও কিছু নয়।' আঙ্‌লটা লুকোল আনন্দ।

ঢিল মারবে বলে'ছিল। যদি ঢিল মেরে মাথাও ফাটিয়ে দিত ফিরেও তাকাত না।

বিয়ের কথা উঠলে মেয়েরা উঠে চলে যায় সেখান থেকে, সে রেওয়াজ তো কবে উঠে গেছে। বরং এখন দাঁড়িয়ে থেকে মন দিয়ে শোনে, ভালোমন্দ দুটো কথা কয়। এ যে দেখি একেবারে লবঙ্গলতা।

ছাতা হাতে নিয়ে এগুলো আনন্দ।

সুনন্দ বললে, 'বাড়ির এদিকটায় আসুন। এদিক দিয়ে একটা শর্টকাট আছে।'

সেই খিড়কির দরজার মুখে সুষীমা দাঁড়িয়ে।

'এ কি, শর্টকাট নিচ্ছেন যে।'

থমকাল আনন্দ। বললে, 'শর্টকাট মানে ?'

'শুনুন,' মুখ টিপে হাসল সুষীমা। 'উকিল-টুকিল হবেন না। উকিল হতে পড়তে পাশ করতে বেশি সময় ; তারপর বসতে, তারপর দাঁড়াতে আরো অনেক, অনেক বছর। প্রায় যুগ। তার চেয়ে শর্টকাট কিছু বেছে নিন—'

'শর্টকাট ?'

'হ্যাঁ, শর্টকাট। যাতে তাড়াতাড়ি একটা চাকরি-বাকরি।' চোখের পাতা দুটি নাচাল সুষীমা : 'বেশি দিন বসে থাকা কি ভালো ? তাড়াতাড়ি, হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি, লুটোপুটি এই তো চলেছে চতুর্দিকে—'

তাড়াতাড়িই বেরিয়ে গেল আনন্দ।

উপর থেকে নামল আরতি।

'ঐ ছেলেটা কে বৌদি ?' বাঁকা করে জিগগেস করল।

'পাশের বাড়ির ছেলে।'

'আগে থেকে তোমাদের চেনা নাকি ?'

'না। চেনা হতে যাবে কেন?'

'বড্ড ভাব দেখলাম।'

'ভাব হল। ভাব হতে আর কতক্ষণ লাগে?' সুব্রতা অন্য দিকে মুখ রাখল। 'নতুন জায়গায় পড়শীদের সঙ্গে ভাব রাখা দরকার।'

'তা সমবয়সীদের মধ্যে ভাব হয়। ঐ ছোঁড়াটার সমবয়সী এ বাড়িতে কে আছে?'

'বিপদের সময় কে আবার বয়েস দেখে!'

'ওর বয়েস না দেখ, তোমার মেয়ের বয়েস তো দেখবে।'

'দেখেছি। যার বয়েস হয়েছে সঙ্গে-সঙ্গে তার বুদ্ধিও হয়েছে। তা মেয়ে ভাববে, আমাকে-তোমাকে ভাবতে হবে না।'

কথাটা সুধীনের কানে উঠল। সুধীন হাসল। সুব্রতা গম্ভীর হল। আর পুড়তে লাগল সুষীমা।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে গরুর গাড়ি বোঝাই করে জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হল আনন্দ। শতরঞ্জি, চাদর, বালিশ, মশারি, জলের ড্রাম, বালতি, মগ, কয়লা, চাল, চিনি—ভারী, জমাদার—কী নয়!

যেন গন্ধমাদন এনে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে রোদ উঠে গেল আকাশে।

রোদও কখনো-কখনো ব্যর্থতার মত দেখা দেয়।

ঝকঝকে দাঁতে হাসতে-হাসতে আনন্দ বললে, 'রোদও নিয়ে এলাম।'

'সব বাজে হল।' টিপ্পনী কাটল আরতি। 'বিছানা ফেলে কে শুতে যাবে শতরঞ্জিতে?'

'না, না, ছিঃ, বাজে হবে কেন?' সুব্রতা খণ্ডন করতে এল। 'কতক্ষণ রোদ থাকে দেখ। তা ছাড়া জলের ড্রাম, বালতি, মগ—সব কাজে লাগবে।'

'ওসব তো তোমার আর্দালি-চাপরাশিও আনতে পারত। আর বাজারের জিনিস কে না আনতে পারে পয়সা ফেলে!' রোদের দিকে তাকাল আরতি। 'আর, এ থাকিয়ে রোদ।'

'যা না লাগে, আমি ওবেলা আসব, নিয়ে যাব ফিরিয়ে।' ঘাড় চুলকাল আনন্দ। 'কালই আমি চলে যাচ্ছি কলকাতা।'

'বৌদি, ওকে জিগগেস করো তো, এখানে সিনেমা আছে কিনা।' আরতি শরীরে একটা বাঁকা টান ফুটিয়ে বললে।

সিনেমার উল্লেখেই বুঝি শরীরে একটা বাঁকা টান ফোটে।

'দু-দুটো আছে।' উৎসাহিত আনন্দের চোখ।

'কোন্‌টায় কী বই চলছে, জিগগেস করো না বৌদি—'

আনন্দই বললে কোন্‌টায় কী বই।

''মধুভাণ্ড'-টা আমি দেখিনি। কলকাতায় রজত জয়ন্তী হয়ে গেল অথচ আমার দেখা হল না।' অনুতাপ আরতির কণ্ঠে।

'আচ্ছা, আমি পাস এনে দেব।' উৎসাহের ঠেলায় বলে ফেলল আনন্দ।

সুধীন ছুটে এল পাশের ঘর থেকে। ত্রস্ত স্বরে বললে, 'পাস-ফাসে দরকার নেই। যেতে হলে পয়সা খরচ করে যাবে। পাসে গেছি শুনলে এসেম্বলিতে কোশ্চেন উঠবে। এনকোয়ারি বসবে। চাকরি যাবে।'

'তুমি যাবে কেন? তোমায় যেতে হবে না। আমি আর বৌদি যাব। কি, বৌদি যাবে তো?' সুব্রতাকে লক্ষ্য করল আরতি।

ননদ দাদার বাড়ি চেঞ্জে এসেছে, কলকাতায় বেশি দিন থাকতে পারল না, কিছু দিন পরেই এখানে বদলি, সঙ্গে সঙ্গে আরেক চেঞ্জে চলে এল, বর এসে শিগ্‌গিরই নিয়ে যাবে স্বস্থানে—তার সাধ-আহ্লাদ একটু মেটাতে হয় বৈ কি।

সুব্রতা বললে, 'মন্দ কি। মধুভাণ্ডটা আমারও মিস হয়ে গেছে।'

সুধীন ফের আপত্তি করে উঠল। 'তুমি গেলে আমারই যাওয়া হল। কান ইজ ইকুয়েল টু মাথা।'

'বা, এ তো তুমি পাস নিচ্ছ না। অন্যের পাসে আমরা যাচ্ছি।' আরতি তর্ক তুলল। 'পাসটা ওর একাউণ্টে, তোমার একাউণ্টে নয়।'

'অত সূক্ষ্ম বুঝবে না কেউ। পাস পাস। টাকা টাকা। ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে পাসে সিনেমা দেখা বরদাস্ত হবে না।'

'তা তুমি তো এখনো চার্জ নাওনি?' সুব্রতা মনে করিয়ে দিল।

'তবে? তবে তুমি এখনো এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট নও। তুমি লেম্যান। তোমার ম্যাজিস্ট্রেট হবার আগেই আমরা দেখে নেব।' সুব্রতার কনুইয়ে চিমটি কাটল আরতি।

'যা খুশি করো।' পরাস্ত হয়ে ফিরে গেল সুধীন।

'তবে দুখানা নিয়ে আসে যেন। বলে দাও বৌদি।'

'আচ্ছা' —

ত্বরিত পায়ে চলে যাচ্ছে আনন্দ, পিছন থেকে সুষীমা কথা কয়ে উঠল। 'কাল সকালেই চলে যাচ্ছেন বড়?'

সিনেমার টিকিট আসবে, সিনেমাতেই ভালো দৃশ্য দেখতে পাবে, তাই ওদের পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে সেখানে আর দাঁড়াল না বা ঘুরঘুর করল না আরতি। উপরে চলে এল।

'বা, আমার কলেজ নেই?' আনন্দ হাসবার চেষ্টা করল। 'আমি কলকাতা থাকি না?'

'তবে এ সময় এখানে?'

'কলেজ কী খেলায় শিল্ড পেয়েছে, না, কি, কোন প্রফেসর মক্কা না অক্কা পেয়েছে, মানে ডক্টরেট না পঞ্চত্ব পেয়েছে—তাই দুদিনের ছুটি।'

'কেন ছুটি তাই জানেন না?'

'ছুটি ছুটি। কেন ছুটি তা জেনে আমার কী দরকার। ভালোবাসা ভালোবাসা। কেমন পাত্র কেমন পাত্রী তা জেনে আমার কী হবে?'

কথার ছটায় অপূর্ব দেখাল আনন্দকে। মুচকে হাসল সুষীমা। বললে, 'জানতে হয় না বুঝি?'

'না। দেরি হয়ে যায়। বাস মিস হয়ে যায়।'

'ছুটি হলেই বুঝি চলে আসেন?' হাসিটি চোখে-মুখে সর্বাঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছে সুষীমা।

'ছুটি না হলেও চলে আসতে পারি। কতক্ষণের বা পথ। আর ছুটি তো সব সময়ে তারিখের রঙে নয়, মনের রঙে। যদি সেই রঙ মনে লাগে তা হলে সব সময়েই ছুটি।'

কী যেন বলতে চাইছিল সুষীমা, থেমে গেল। মন্থর হয়ে গেল তার ভাব-ভঙ্গি। যেন পথ সহজ নয়। সব দিনেই ছুটির রঙ লাগে না। রঙছুট দিনের ভারই জীবনে বেশি।

'বিকেলে আসব।'

'আসবেন?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুষীমা।

'হ্যাঁ, ঢিল ছুঁড়তে হবে না।'

'কিন্তু আপনার তো ধারণা ঢিল না ছুঁড়লে আর ঘুম ভাঙে না।'

'ঢিল ছুঁড়লে তাড়াতাড়ি ভাঙে।'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি—আপনি তো এমনি তাড়াতাড়ির ভক্ত। ভোগে দেরি হবে বলে জানতে পর্যন্ত নারাজ।' সুষীমা আনন্দের চোখের দিকে তাকাল ভয়ে-ভয়ে। 'অথচ এক বিষয়ে আপনি বিপরীত কেন? গদাই লস্কর কেন?'

'কোন্ বিষয়ে?'

'আপনার কেরিয়রের বিষয়ে, অর্থোপার্জনের বিষয়ে।'

'আবার সেই কথা?' বিরক্ত হল আনন্দ।

'বারে বারে ঘুরে-ফিরেই সেই কথা। যতক্ষণ পারি—'

'আপনি ওকালতির কী বোঝেন?' কণ্ঠস্বরে প্রায় রুখে দাঁড়াল আনন্দ।

'না আমি কী বুঝি! তবে এইটুকু বুঝি যে ওটা খুব দূরের পথ, দেরির পথ। আপনি আবার দেরি পছন্দ করেন না কি না। তার চেয়ে একটা চলনসই চাকরি বাকরি ভালো।'

'মাথা খারাপ! চাকরি করব? চাকর হব? চিঠিতে ইওর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট লিখব? কখ্খনো না।' গর্জে উঠল আনন্দ। 'স্বাধীন থাকব। স্বাধীন ব্যবসা করব—'

'বা, ছেলেরা বুঝি ঘর বাঁধে না, সংসার করে না?'

'মাথা খারাপ!' যা মুখে এল তাই বলে গেল আনন্দ। 'যে সংগ্রামী তার আবার ঘর-সংসার কী! পথই আমার ঘর। শূন্য প্রান্তরই আমার সংসার!'

প্রায় ছুটতে-ছুটতে চলে গেল।

তিন

সন্ধ্যার আগে-আগে ঠিক হাজির হল আনন্দ।

এমন দৃশ্য দেখবে ভাবেনি। দেখল, বাইরের ঘরে মহকুমা হাকিমের ছেলে সরলকান্তি একটা চেয়ারে বসে গিটার বাজাচ্ছে। আরো দুটো চেয়ার মুখোমুখি, একটাতে সুধীন আরেকটাতে সুষীমা বসে। সুষীমার হাতের তালুতে চিবুক নামানো। মানে তন্ময়তায় চিত্রিতা হয়েছে।

বেরসিক কাঠখোট্টার মত ঢুকে পড়েছে আনন্দ।

তাই। দুপুরবেলায় ঘরের জানলাটা খোলেনি একবারও। এ শ্রীমান সামিল হলেন কখন? কখন হাত রেখেছেন বাজনায়? কখন সুর তুলেছেন? শুধু বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন? না সেই সঙ্গে বাজছে কারু হৃদ্‌যন্ত্রে?

সকালবেলায়ই এস ডি-ওর বাড়িতে যথারীতি গিয়েছিল সুধীন। সকলের সঙ্গেই সবিস্তার আলাপ করেছে। ঘরের কথা পরের কথা কিছুই আর বাকি নেই, মুলতুবি নেই। এও বলতে হয়েছে, তার বড় মেয়ে সুষীমাকে আই-এ পাস করার পর আর পড়াচ্ছে না, সম্বন্ধ খুঁজছে।

এস-ডি-ও সরোজকান্তি বললে, 'যত দিন সম্বন্ধ না জোটে তত দিন পড়ে যাওয়াই তো ভালো। তা ছাড়া এখানে তো কলেজে মেয়েদের মর্ণিং ক্লাস আছে—'

'ও আমি দেখেছি। পড়ার মধ্যে মেতে থাকলে বিয়ে আর হতে চায় না। শেষে না থেমে এম-এ পর্যন্ত। তার পর পাসের পর পাত্র নেই। এম-একে বিয়ে করতে ঘেমে উঠবে।' হাসতে লাগল সুধীন।

এস-ডি-ওর জনপ্রিয় হবার পাঠ, আর, পরের মতে সায় দেওয়াই জনপ্রিয় হবার উপায়, তাই সরোজ সায় দিল। 'হ্যাঁ, তারপর অহরহ পড়া আর পরীক্ষার দুশ্চিন্তায় শরীর হয় দড়ি পাকায়, নয় পিপে হাঁকায়। এ বেশ বাড়িতে থাকবে, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবে, শ্রীলাবণ্য বনবাসে পাঠাবে না।'

'কিন্তু এডিশান্যাল একটা কোয়ালিফিকেশান থাকা ভালো। হয় গান নয় বাজনা নয় ছবি নয় সাহিত্য—' পাশের ঘর থেকে সরল মন্তব্য ঝাড়ল।

'গান-বাজনা জানে আপনার মেয়ে?'

'না। কোত্থেকে জানবে? কোনো কোচিং পায়নি তো?'

'গান আর হবে না। তবে বাজনা হতে পারে।' পাশের ঘর থেকে সরলের আবির্ভাব হল।

'তোর গিটারটা নিয়ে আয় না। একটু শোনা না।' গর্বভরে অনুরোধ করল সরোজ।

গিটার নিয়ে এসে বাজাতে বসল সরল।

কী বাজাল না বাজাল কী বুঝল না বুঝল, মুখর হয়ে উঠল সুধীন। বললে, 'সুষীমাকে বলব যদি গিটার শিখতে চায়—'

'আজকাল প্রায় মেয়েই গিটার শেখে।' বললে সরল, 'রবিবারের গানের স্কুলে যাওয়া পথচলতি মেয়ের ভিড় যদি দেখেন, দেখবেন এক হাতে ডিবে আরেক হাতে গিটার– '

'ডিবে বুঝলেন তো?' সরোজ ধাতস্থ করতে চাইল সুধীনকে। 'ফুটানির ডিবে, ফুটানিকা ডিব্বা, ভ্যানিটি ব্যাগ—'

সরোজ হাসছে, সুধীনকেও হাসতে হল।

'আজকাল স্বরস্বতীপুজোয় প্যাণ্ডেল দেখেছেন?' সরল বললে, 'সরস্বতীর হাতে বীণা নেই, গিটার। অথচ বানান জিগগেস করুন বলতে পারবে না কেউ।' যেন সরলই পাবে এমনি ভাব করল।

'মন্দ কি। যাস না ওদের বাড়ি। শুনিয়ে আসিস—কত ফাংশানেই তো শোনাস – কী যেন নাম বললেন?

'সুষীমা।'

'বেশ নাম তো? শুধু সীমা নয় সুষীমা। সুষমাও নয়। সুষীমা। সমতায় নয় সীমায় সুন্দর। তাই না মানেটা?' সরোজ তাকাল সুধীনের দিকে।

'কোনোদিন শুনিনি এমন নাম।' সরল ফোড়ন কাটল।

'না। বানানটাও গোলমেলে।' বললে সুধীন।

বানান নিয়ে আলোচনা উঠলেই মুশকিল। কেটে পড়ল সরল। অভিধানটা দেখে রাখি।

সেই সুবাদেই সরল এসেছে গিটার নিয়ে। তখন সুব্রতা আর আরতি যাচ্ছে সিনেমায়। সুধীনকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে সুব্রতা জিগগেস করলে, 'কে ?'

স্বরকে সম্ভ্রান্ত করে সুধীন বললে, 'এস-ডি-ওর ছেলে। এম-কম পড়ছে।'

'সঙ্গে ওটা কি ?'

'বাজনা। গিটার। গিটার শোনাতে এসেছে।'

'বা, আমরা তো সিনেমায় যাচ্ছি।' আরতি ছটফট করে উঠল।

'তুমি আর সুষীমা শোনো।' বললে সুব্রতা।

'আবার সুষীমা কেন ?' যেমন স্বভাব, আরতি যেন ভূত দেখল।

'না বাজনা শুনতে দোষ কী! আর কোন বাজনা ভালো বাজে এ বুঝতে সুষীমা ভুল করবে না।'

'চা-মিষ্টি যেন খাওয়ায়। আদর-আপ্যায়নে যেন ত্রুটি না করে। তুমি আছ তুমিই দেখো।' সুব্রতা চোখের ঝিলিকে শেষ উপদেশ দিয়ে চলে গেল আরতির সঙ্গে, সাইকেল-রিক্শাতে, আগে-পিছে চাপরাশি নিয়ে।

সুষীমা যে চা-মিষ্টি আনতে উঠবে তার পর্যন্ত সময় দিচ্ছে না সরল। আরেকটা শুনুন—একটার পর একটা গৎ শোনা আর বাবার সঙ্গে-সঙ্গে গদগদ হয়ে ওঠা এ এক দুর্ধর্ষ ব্যায়াম। বরং জল-ভরতি বাটি সাজিয়ে তাতে কাঠের বাড়ি মেরে মেরে জলতরং বাজনা শিখবে, তবু গিটার শিখবে না।

'শুনুন—শিখুন। চমৎকার বাজনা।'

ঠিক সেই সময়ে যজ্ঞস্থলে রাক্ষসের উৎপাতের মত ঢুকল আনন্দ।

'বাবা, এত দূরের রাস্তা, আসতে আসতে একেবারে সন্ধে।'

গায়ে যেন হাওয়া লাগল এমনি খুশিতে উঠে দাঁড়াল সুষীমা। যেন বাজল ছুটির ঘণ্টা। সেই ঘণ্টা গিটারের বাজনার চেয়েও মিষ্টি।

বাজনা থামাল সরল। আনন্দের সঙ্গে চোখাচোখি হল।

যখন থেকে জানালা বন্ধ তখন থেকে আনন্দের বাজনাও বন্ধ। বাজনাই যদি বন্ধ থাকে তবে পথও দীর্ঘ হয়ে যায়।

'কি, যাবেন বেড়াতে?' কারু দিকে তাকাবার প্রয়োজন নেই, সরাসরি সুষীমাকে লক্ষ্য করল আনন্দ।

'যাব।' স্ফূর্তিতে উছলে উঠল সুষীমা। মাথার খোলা চুল হাত প্যাঁচ করে বাঁধা ছিল, আলতো হয়ে নেমে এসেছিল ঘাড়ের উপর, সেইটে ফের বাঁধতে লাগল। ডাকতে লাগল, 'ও সুনন্দ, ও সুমিতা, যাবি বেড়াতে?'

'এখানে আবার বেড়াবার জায়গা কোথায়?' টিটকিরি করে উঠল সরল।

সুষীমা উত্তরের জন্যে তাকাল আনন্দের দিকে। আনন্দ বললে, 'বেড়ানোর জন্যে জায়গা লাগে নাকি? বেড়ানোর জন্যে মন লাগে। স্থানে ভ্রমণ নয়, মনে ভ্রমণ।'

হো হো করে হেসে উঠল সরল। বললে, 'তা হলে কোথাও না গিয়ে বাড়িতে বসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকলেই চলে।'

কী একটা ঝগড়াটে উত্তর দেবে বলে তৈরি হচ্ছে আনন্দ। এমনি মনে হল সুষীমার। মনে হল আনন্দ যেন খুব চালাক নয়, কার্যোদ্ধারের হিসেব জানে না। এখন ঝগড়া করতে গেলে তো সোনার সন্ধ্যাটাই মাটি।

হ্যাঁ, ঠিক আস্তিন গুটিয়েছে আনন্দ। বলে উঠল, 'হ্যাঁ চলে, যদি সঙ্গে একটা গিটার থাকে।'

মাঝখানে পড়ল সুষীমা। সরলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেন,

এখানে নদী আছে, না ? নদী থাকলেই তো বেড়াবার জায়গা। তাই নয় ?'

'নদীর ঠিক ধার ঘেঁষে রাস্তা নেই। মাঝখানে সব চাষের ক্ষেত।' সরল বললে।

সে আমি বুঝব। চাষের ক্ষেত পেরিয়ে কী করে যেতে হয় জলের ধারে সে আমার দায়িত্ব।' আনন্দ বললে।

'আমি আপনাকে বলছি না।' মুখিয়ে এল সরল।

'আমিও আপনাকে নয়।' আনন্দের ভঙ্গিও তেমনি কাঠখোট্টা।

মাঝখানে পড়ল সুধীন। বললে, 'কিন্তু এখন কি বেড়াতে বেরুবার সময় আছে ?'

'খুব আছে।' বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে সুষীমা। তারপর সরলকে লক্ষ্য করল : 'আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে। জলের ধারে বসে গিটার বাজাবেন। দাঁড়ান, আমি ঠিক হয়ে আসছি।' শেষের কথাটা আনন্দকে লক্ষ্য করা।

সরল ডিরেক্ট লাইনের লোক, সরকারের লোক, তাকেই কিনা তাচ্ছিল্য করল সুষীমা। চলুন না আমাদের সঙ্গে। কেন, শুধু চলুন না বলতে পারত না ? বলা উচিত না ? বলা উচিত ছিল না, চলুন না আমাকে নিয়ে। আর ওর বাবার ব্যবহারটাই বা কি। মেয়েকে আটকাবে না ? উপযুক্ত সঙ্গী দেবে না নির্বাচিত করে ? একটা লোফারের সঙ্গে বাইরে পাঠাবে ? দাঁড়াও না বাবাকে বলে দেব।

উঠে বাইরের বারান্দায় এল সরল। তাকে এগিয়ে দিল সুধীন।

সরল জিগগেস করলে, 'কে ঐ লোকটা ?'

'তুমি চেন না ?'

'না। মাঝে-মধ্যে আসি, এ শহরের সকলকে চিনি কই ?'

'এই পাশের বাড়িটা ওদের। ছেলেটি ল পড়ে।' বাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করল সুধীন।

সরল হাসি দিয়ে ঠোঁটের উপর বিদ্রূপের রেখা আঁকল। বললে, 'যার তার সঙ্গে মেয়েকে মিশতে দেবেন না।'

নিস্পৃহের মত মুখ করল সুধীন। বললে, 'না, মিশছে কোথায়? নতুন জায়গা, এই একটু দেখছে ঘুরে-ফিরে। কলকাতায় তো বাড়ির কাছে নদী পেত না।'

'তা হলেও, আপনি অভিজ্ঞ লোক, লোকের চালচুলো দেখতে হয়।' সরল চোখ-মুখ ঘোরালো করল। 'জায়গাটা ভালো নয়।'

'না, ছেলেটি কত করল আমাদের জন্যে। বৃষ্টিতে কী বিপদ মাথায় করে এসেছিলাম, আনন্দ সব সুরাহা করে দিয়েছে। কোথায় ভারী, কোথায় জমাদার, সব যোগাড় করে এনেছে। একটা কাঁটাও বিঁধতে দেয় নি।'

'আপনি আমাদের কাছে খবর পাঠাননি কেন?' আপন জনের মত সরল বললে।

'ওরা প্রতিবেশী, হাতের কাছে—'

'প্রতিবেশী না ছদ্মবেশী।' টিটকিরী দিয়ে উঠল সরল। 'সরকারী কর্মচারীকে দেখতে সরকারী কর্মচারী ছাড়া কেউ নেই। পাবলিককে আমাদের মিত্র মনে করবেন না। পাবলিক আছেই কি করে পিছনে লাগবে আর বেনামী পাঠাবে।'

সুধীন হাসল। বললে, 'তবু কেউ যদি মিত্রতা দেখায় তা নেব না কেন? সরকারী কর্মচারী মানুষ আর পাবলিকের নির্বাচনেই সরকার। সুতরাং আমরা তো পাবলিকেরই চাকর। পাবলিকই তো আমাদের সুখে দুঃখে এসে দাঁড়াবে—'

'কিন্তু জানেন কি জায়গাটা খারাপ—'

'সব জায়গাই খারাপ। যত জায়গায় গিয়েছি সর্বত্রই শুনেছি জায়গাটা খারাপ। সব জায়গাই সমান।'

'আর আমি কী বলব,' তবু সরল গলা নামাল, 'আপনার মেয়ে বড় হয়েছে।'

'সেই তো ভরসা।' যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সুধীন। 'মেয়ে বড় হয়েছে। ওই নিজের ভালোমন্দ বুঝে নিতে পারবে। বেশ তো, তুমিও যাও না ওদের সঙ্গে।'

আবার ওদের সঙ্গে! সরল বললে, 'না, আমার কাজ আছে।'

সদরের দিকে সরল এখনো দাঁড়িয়ে আছে বলে সুষীমা খিড়কির দিকে গেল। আনন্দকে বললে, 'ঐ পথ দিয়ে নয়, এখান দিয়ে বেরিয়ে যাই।'

আনন্দ যেন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষের পক্ষপাতী। হয়তো বা সম্মুখ সংঘাতের। যাতে লুকোছাপা আছে, পালিয়ে যাবার ইঙ্গিত আছে সে তাতে আকৃষ্ট নয়। বললে, 'কেন, এদিক দিয়েই আসুন।' সদরের দিকেই ডাকল আনন্দ।

ঐ আবার হঠকারিতা দেখাতে চায়। সুষীমার মনে হল, যদি সহজে হয় তবে দুরূহে কে যায়। বলের চেয়ে ছলই বেশি ভদ্র। কে যায় অনর্থকে।

সুষীমা খিড়কির দরজা দিয়েই বেরুল। আনন্দ বেরুল সদর দিয়ে, সকলের চোখের উপর দিয়ে, জানিয়ে শুনিয়ে। আটকাতে চাও তো আটকাও। দেখি কত গায়ের জোর।

পাশের জমিটুকুতে মিলল দুজনে। সুষীমা বললে, 'এই সামান্য-টুকুতেও আপনার ঘুরপথ।'

'কিন্তু আপনার ঐ চোরের শর্টকাটের চেয়ে বীরের ঘুরপথ অনেক

ভালো। বেশ একটা জয়-জয় ভাব আছে না?' যেন বুক ফুলিয়ে বললে আনন্দ।

ঘাড় হেলিয়ে মুখ টিপে হাসল সুষীমা। বললে, 'অনেক সময় বাঙলা জয়ের দিকে গেলে ইংরিজি জয় হারাতে হয়। আমাদের ইংরিজি জয়েই পক্ষপাত।'

'ইংরিজি জয়?' থমকে দাঁড়াল আনন্দ: 'ইংরিজি জয় আবার কি!'

'ইংরিজি জয় মানে আপনি!'

'আমি?' যেন গোলকধাঁধায় পড়েছে, চারদিকে তাকাতে লাগল আনন্দ।

'আপনার নাম?'

'আনন্দ।' নিজের নামটা গভীর আদরে উচ্চারণ করল আনন্দ। বললে, 'হ্যাঁ,—কিন্তু জয় ছাড়া আনন্দ কোথায়? বোধ হয় এইখানে এই একটি শব্দে পূর্বে-পশ্চিমে সার্থক মিলন হয়েছে। জয়—জয়। কিন্তু জয়ই লক্ষ্য। যে জয়া সেই আনন্দিত।'

করুণমন্থর স্বরে বললে সুষীমা, 'আমার মনে হয় আনন্দই লক্ষ্য। জয়-পরাজয় অবান্তর। জয়ের মধ্যে জোর আছে বটে, কিন্তু সব সময়েই আনন্দ নেই। দেখুন না যুদ্ধে যে জেতে সে আর যাই পাক আনন্দকে পায় না। অনেক সময় পালিয়ে গিয়ে, হেরে গিয়েও পাওয়া যায় আনন্দকে।'

'ওরকম চালাকি করে পাওয়ার মধ্যে আমি নেই। হিসেব করে পাওয়া।'

'কিন্তু আপনি যে পথ ধরতে যাচ্ছেন সেও তো চালাকির পথ—'

'আবার সেই আইনের কথা তুলছেন? মোটেও সেটা চালাকির

পথ নয়। সেটা দাবির পথ, দৃঢ়তার পথ, স্বত্ব-সাব্যস্তের পথ—শক্ত মুঠোতে আঁকড়ে ধরে ছিনিয়ে নেবার পথ—' নিজের মুঠোই আঁট করে চেপে ধরল আনন্দ।

সুনন্দ-সুমিতা-দেবল নিজেদের খেয়ালে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে? সুষীমা আরতির পাঁচ বছরের ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়েছে, যেটা তার জিম্মায় রেখে আরতি গিয়েছে সিনেমায়। ওটাই বুঝি এখন ব্যবধানের দেয়াল। শালীনতার পতাকা।

নদীতে যাবার পথটি কোনো গলিঘুঁজির মধ্য দিয়ে নয়। খোলা মাঠের উপর দিয়ে। সমস্ত দৃশ্যটি তাই সুধীনের চোখের সামনে খোলা। সরলেরও।

'বেশি দেরি করিস নে।' তবু চেঁচিয়ে একবার মনে করে দিল সুধীন।

'আমি এবার আসি।' বললে সরল, আর সমর্থনের অপেক্ষা না করেই চলে গেল বাঁকা পথে। ঠিক করল গিটারে চলবে না, এবারে ঢাক নিতে হবে।

চলতে-চলতে আনন্দ বললে, 'দুপুরে দাঁড়ান নি কেন জানলায়?'

সরাসরি এমন একটা প্রশ্ন কেউ করতে পারে ভাবতেও পারত না সুষীমা। প্রশ্নের আলোর ঝাপটায় দু-চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ঘোরটা একটু কাটতেই পাল্টা জিগগেস করল, 'কোন জানলায়?'

'সকালে যে জানলায় দাঁড়িয়েছিলেন—'

'সকালে দাঁড়িয়েছিলাম বলে দুপুরেও দাঁড়াতে হবে?'

'নিশ্চয় হবে।'

'কোন আইনে?' চোখের পাতার পালক যেন কাঁপতে লাগল সুষীমার। 'সকালে বৃষ্টি হয়েছিল বলে দুপুরেও বৃষ্টি হবে?'

'ঘন কালো মেঘ যদি ছেয়ে থাকে, জমে থাকে, তবে কেন হবে

না ? আমি যদি ওপারের জানলায় সারাক্ষণ বসে থাকি তবে কেন আপনি দাঁড়াবেন না ? কেন ঝরবে না বৃষ্টি ?'

'বৃষ্টি ? আমি বুঝি বৃষ্টি ?'

'হ্যাঁ, চন্দনের বৃষ্টি ।'

'ভাগ্যিস ক্রন্দনের বৃষ্টি বলেন নি ।' ছোট-ছোট শব্দ ছড়িয়ে হেসে উঠল সুষীমা ।

'কিন্তু এলেন না কেন ? একটুও আপনার সময় হল না ? ফরাশ পেতে ফলাও করে ঘুমুলেন বোধহয় ?'

'সারাক্ষণ ওপারে বসে থাকলে এপারে দাঁড়ানো যায় ? লোকে বলে কী ! তা ছাড়া চন্দনেরও তো বন্ধন আছে ।'

যেন অসম্ভব কিছু শুনছে এমনি বিস্ময়ে বলে উঠল আনন্দ । 'বন্ধন আছে ?'

'নেই ? সতরো গণ্ডা বন্ধন । পিসিমা বললেন, ছোঁড়াটার ঘরের মুখোমুখি এ-ঘর, এটাতে আমি থাকব, সুষীমা-সুমিতা ভিতরের ঘরে থাকবে ।'

'এই বন্ধন ? জানলার ছিটকিনির বন্ধন ? মুখোমুখি ঘর দিলেন না, মুখোমুখি মাঠ করে দিলেন ।'

'সে তো আমার গুণ ।'

'একশোবার আপনার । চন্দনের গুণ । বন্ধন কি করবে চন্দনকে ? শত ত্বক আর কাঠ, গ্রন্থি আর শিরা ঢাকতে পারবে না তাকে, রাখতেও পারবে না । সব কিছু ছাপিয়ে উঠবে, ছাড়িয়ে উঠবে তার সুগন্ধ । বসন দিয়ে কি আর আগুনকে ঢাকা যায় ?'

'পিসিমা আপনাকে কী বলেন জানেন ?'

'কী বলেন ?'

'বলেন, নির্লজ্জ ।'

হোঁচট খেল নাকি আনন্দ? না হাসির তরঙ্গ উদ্বারিত করে দিল। বললে, 'শুধু পিসিমা কেন, তার ভাইঝিও বলুন সমস্বরে। কিংবা ভাইঝিটি বলুন একটু নিরালায়। ঠিকই বলেন, ঠিকই বলবেন। নির্লজ্জতা কি কলঙ্ক, না, অলঙ্কার? আমি তো নির্লজ্জই। তাতে আমি এতটুকু ম্লান হই না। যে তেজী সেই পারে নির্লজ্জ হতে। সূর্য নির্লজ্জ, আগুন নির্লজ্জ, তরোয়াল নির্লজ্জ। জীবনের চরমতম আনন্দ নির্লজ্জ।'

'এ সব বলতে আপনার এতটুকু বাধছে না!' এটা সুষীমার অভিযোগ বা প্রশংসা সহসা বুঝে উঠতে পারল না আনন্দ।

তবু বললে, 'কেন বাধবে? আমি তো উকিল হতে চলেছি। উকিলের মুখে কি কিছু আটকায়? উকিলের মত আর নির্লজ্জ কে?

এতক্ষণে নদীর প্রান্তে এসে গিয়েছে তারা এবং একটানা জল ও কাছে-দূরে নৌকো দেখে সবচেয়ে বেশি উথলেছে আরাধন, আরতির শিশু। নানা প্রশ্নে অস্থির করছে সুষীমাকে, আর শিশুর কৌতূহলের কাছে অপরিচিত বলে কেউ নেই, তাই আনন্দকেও রেহাই দিচ্ছে না। একমুখে তাই তারা শিশুর সঙ্গে, আরেক মুখে একে-অন্যের সঙ্গে কথা কইছে।

আরাধনের এখন একটা নৌকোর প্রয়োজন। কাগজের নৌকো যদি তৈরি করে দিতে পারো, জলে ভাসিয়ে দিই, নচেৎ ঐ একটা কাঠের নৌকো ডেকে আনো তাতে করে দেখতে চলি নদীটা।

সুষীমা বললে, 'আপনি আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা কইছেন যেন আমাদের কতদিনের আলাপ।'

'কতদিনের আলাপ বলে আপনার মনে হয়?'

'মনে হবে কি। যা সত্যি তাই। মোটে একদিনের আলাপ। তাও পুরো চব্বিশ ঘণ্টা নয়—'

'মানে পুরো এক দিন এক রাত্রির নয়।' কী সাংঘাতিক ভাবে হাসল আনন্দ।

'না, মোটে বারো ঘণ্টা।'

'এক ঘণ্টায় ক' মিনিট জানেন?'

'জানি।'

'এক মিনিটে ক' পল? এক পলে ক' বিপল? এক বিপলে ক' অনুপল? পারেন হিসেব করতে? মাথায় ব্ল্যাক ম্যাটার—এক রাজ্যের চুল তো আছে দেখছি, বলি গ্রে ম্যাটার কিছু আছে। অঙ্ক-টঙ্ক আছে কিছু?'

'অঙ্কটা যত একান্ত করে দাঁড় করান না কেন, একদিনের আলাপের পক্ষে এ বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

'আপনি বলতে যাচ্ছেন তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

'ভীষণ তাড়াতাড়ি।'

'এর চেয়েও কম আলাপে এর চেয়েও বেশি তাড়াতাড়ি হওয়ার দৃষ্টান্ত আপনি দেখেননি?'

যেন অবাক মানল সুষীমা। 'এর চেয়েও বেশি?'

'হ্যাঁ, ঢের ঢের বেশি। কল্পনাতীত বেশি। যেদিন রাতে সানাই বাজে আর তুটি সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবক-যুবতী সামান্য একটি দৃষ্টি-বিনিময়ের পরেই একসঙ্গে, আঁচলে-কোঁচায় গিঁট বেঁধে এক ঘরে শুতে যায়—দেখেননি?'

'কোথেকে দেখব?' সুষীমা একটুকুও আহত বা অভিভূত হল না। পরিচ্ছন্ন গলায় বললে, 'কিন্তু আপনি—আপনি তো উকিল হতে চলেছেন। ওকালতির পথ তো তাড়াতাড়ির পথ নয়, আস্তে-আস্তের পথ, ধীরে-সুস্থের পথ। আর, আইনের দেরির কথা, কুড়েমির কথা জগৎ-সংসারে কার অজানা?'

হঠাৎ যেন মেতে উঠল আনন্দ। একটা সুর বার করল। বললে, 'ছার রাজ্য ছার সিংহাসন, তোরে লয়ে হব বনবাসী।'

'কারে লয়ে?'

লাজুক একটি হাসি আনন্দের চোখের কোণে ভেসে উঠল। বললে, 'কাউকে নিয়ে নয়। অভিনয়ে একটা পার্টের কথা আওড়ালাম।'

'সবটাই হয়তো এক বেলার অভিনয় বলে ভাবছেন।' গম্ভীর হল সুষীমা।

'মোটেই অভিনয় নয়। বলতে চাচ্ছিলাম ছার আইন ছার ওকালতি।' আবেগের ঢেউ তুলল আনন্দ। 'এই দণ্ডে, এই মুহূর্তে নৌকো করে ভেসে পড়তে পারি নদীতে। ডাকব নৌকো? যাবেন?'

এক কলসী ঠাণ্ডা জলই প্রায় সোজা উপুড় করল সুষীমা। 'চমৎকার বলেছেন। পরের ছেলেকে নিয়ে নৌকোয় ভাসি।'

'ও! পরের ছেলে— সেটা আমার খেয়াল ছিল না।'

কী রকম মানে দাঁড়াচ্ছে কিছু ঠিক স্পষ্ট ধরতে পারছে না সুষীমা। বললে, 'পরের ছেলে যদি নাই বা থাকত সঙ্গে, তা হলেও নৌকো করে যেতাম কোথায়? নিরুদ্দেশে? উঠতাম কোথায়? আঘাটায়? এমন সর্বনাশের পথে কেউ পা বাড়ায়? না, বলে কেউ বাড়াতে?'

সত্যিই তো, ততটা তো ভাবেনি আনন্দ। তবু সাহসে উদ্দীপ্ত হয়ে বললে, 'যে ভালোবাসতে জানে, তার আর ভয় কি, সেই ভালোবাসতে জানে।'

'রাখুন।' প্রায় ধমকে উঠল সুষীমা। 'ঐ যে কথায় বলে, ঘর নেই তার উত্তর শিয়র। আশা নেই বাসা নেই, তার আবার ভালোবাসা! ওকালতি, না বোকালতি! ঐ রকম প্ল্যানছাড়া হাল-দাঁড়-ছাড়া নৌকোবিহারে কে রাজী হবে? ঐ দেখুন না সরলকান্তিকে—'

'কাকে?' খেঁকিয়ে উঠল আনন্দ।

ঐ যে এস-ডি-ও সাহেবের ছেলে, গিটার বাজাচ্ছিল—'

'মিস্টার গিটার ?'

'কেন, ঠাট্টা কেন ? গিটার তো বেশ ভালো বাজায়।'

'তাই তো বলছি, গিটার নয়, ইটার। বাদক তো নয়, খাদক।'

'বাঘ বলতে চান ?'

'না, না, বাঘ হবে কেন ? বাঘ তো ম্যান-ইটার। আর উনি তো সরল, উনি ওম্যান-ইটার।'

'কী নিন্দুক ! কী হিংসুক !' সুষীমা মরীয়ার মত বলে উঠল। 'কিন্তু আপনার চেয়ে শতাংশগুণে ভালো—'

'কিসে ভালো জিগগেস করি ?' সুষীমার দিকে দু' পা এগিয়ে এল আনন্দ।

'প্রথমত, সংস্কৃতিতে।'

'সংস্কৃতিতে মানে ?'

'চারুশিল্পে। দেখুন না কেমন গানবাজনা জানে। আপনি জানেন ?'

'বেশ। দ্বিতীয়ত ?'

'দ্বিতীয়ত চেহারা। আপনার চেয়ে দেখতে ঢের ঢের সুন্দর।'

"কিন্তু আমার সঙ্গে পারবে ও গায়ের জোরে ?' অন্ধ হয়ে গেল নাকি আনন্দ ! যেন সুষীমাই প্রতিপক্ষ, ডান হাত দিয়ে তার বাঁ হাতের কবজিটা সজোরে চেপে ধরল।

এত জোরে ধরেছে যে সুষীমা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ করে উঠেছে যা আনন্দের আর্তনাদ। দুই চোখে জ্বালা পুরে সুষীমা বললে, 'ছি, আপনি গায়ে হাত তোলেন !'

মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল আনন্দ। বললে, 'বুঝতে পারিনি। মার্জনা করুন।'

দুই চোখে মার্জনা পুরে তাকাল সুষীমা। বললে, 'কিন্তু দয়া করে আমার কথাটা শুনুন। পরের প্রশংসা শুনলে এমন ক্ষিপ্ত হওয়াটা সভ্যতা নয়।'

'কিন্তু নিজের নিন্দা শুনলে?'

'তাও নয়। অনেক সময় মহত্বকে গৌরব দেওয়ার জন্যেই নিন্দা।'

'হবে। বলুন আপনার কথা শুনব।'

'বলছিলাম সরল বাবুর কথা।' একটু থামল সুষীমা, দেখল আনন্দ প্রায় নির্লেপানন্দ। 'জানেন উনি এম-কম পড়ছেন, এবার সিকসথ্ ইয়ার। পরীক্ষা পাশ করে বেরিয়ে এসেই উনি এক আমেরিকান ফার্মে চাকরি পাবেন সব ঠিক হয়ে আছে। শুরুতেই চারশো টাকা মাইনে।'

'আপনাকে বলেছে ও এসব কথা?'

'আমাকে বলেনি। কিন্তু বাবা যখন ওদের বাড়ি গিয়েছিলেন সকালে, ওর বাবা এস-ডি-ও সাহেব নিজে বলেছেন!'

'বলেছেন! সব গ্যাঁজা, নির্ভেজাল গ্যাঁজা।' ধোঁয়ার মতন কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইল আনন্দ।

'কেন, মিথ্যে হতে যাবে কেন? মাইনেটা বেশি করে বলে থাকেন, বলুন, কিন্তু, আর যাই হোক, কেমন সুন্দর করে প্ল্যান করেছেন দেখুন। কেরিয়রকে ছকে নিয়েছেন। আর মাস ছয়েক পরেই সরলবাবু টাকার মুখ দেখবেন। আর আপনি? আপনার ওকালতি—সে কোন্ দূর দুর্গম অরণ্যের পথ।'

ভেবেছিল বিকারের রেখা ফুটতে দেবে না, কিন্তু আনন্দ ভঙ্গিটা করল প্রায় বাণাহতের মত। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'বেশ তো অরণ্যের পথ ছেড়ে য়্যাশফল্টের রাজপথ ধরুন।'

'আপনি এত কম বোঝেন।'

'বেশ তো যে বেশি বোঝে তাকে ডেকে আনলেই পারতেন। বেশ তো, দাঁড়ান, আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বলে আরাধনের হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে ফিরে চলল আনন্দ।

'বেশ মানুষ আপনি।' একটু ব্যগ্র স্বরে ডেকে উঠল সুষীমা। 'হাতে ব্যথা দিয়ে জখম করে পালিয়ে যাচ্ছেন। কোনো শুশ্রূষার কোনো উপশমের ব্যবস্থা করে গেলেন না– '

তক্ষুণি ফিরে এল আনন্দ। সুষীমার হাতের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'খুব লেগেছে, না ? এখনো লেগে আছে ?'

'এই দেখুন না হাত কেমন লাল হয়ে উঠেছে।' মণিবন্ধটি গোল করে ঘোরাল সুষীমা।

ফিকে হয়ে আসা অল্প আলোয় স্পষ্ট দেখল আনন্দ ফর্সা-ফর্সা কব্জির কাছটুকু কেমন লালচে-লালচে। হাতে একটি সোনার সরু বালা, মকরমুখো। জোড়ের মুখ দুটি কেমন নিটুট হয়ে মিলেছে, কেমন বিস্তৃত উৎসাহে। হাতের ভূষণ গয়না, না গয়নার ভূষণ হাত তা কে বলবে। সহসা বাঁ হাতের মধ্যে সুষীমার রক্তিমাভ মণিবন্ধটি নিয়ে ডান হাতে আঘাতের জায়গাটুকুতে হাত বুলুতে লাগল আনন্দ।

চোখে দুষ্টুমি পুরে সুষীমা জিগগেস করল, 'একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না ?'

'বেশি মানে ?' থামল আনন্দ।

'বেশি, মানে', সুষীমার দুই চোখে সেই টলটলে দুষ্টুমি, 'ব্যথার জায়গাটুকুতেই না থেকে একটু বাইরে চলে যাচ্ছে না কি সেবাটা ?'

'হয়তো যাচ্ছে। কিন্তু, জানো –' হাত ছেড়ে দিল না আনন্দ। 'তোমাকে বলি, তোমাকে বলতে বাধা কি, আমি এই বেশি। আমি অধিকন্তু। আমি শুধু ব্যথার জায়গাটুকুতেই থাকি না, তা অতিক্রম করে চলে আসি আনন্দে।'

এবার দুষ্টুমি নয়, চোখে যেন মমতা ডেকে আনল সুষীমা। বললে, 'এই এতক্ষণে আমাকে আপনি আপনার বলে ডাকলেন।'

'আপনার বলে ?'

'হ্যাঁ, তুমি বলে।'

'সজ্ঞানে ?'

'হ্যাঁ, সজ্ঞানে।

সজ্ঞানেই হাতখানি এবার ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল আনন্দ। যখন সজ্ঞানে আপনার বলে ডাকটি শুনতে পেয়েছে সুষীমা তখন আর হাত ধরার দরকার কি। হাত ধরলেও আপনার, না ধরলেও আপনার।

বরং আগের কথারই খেই ধরল আনন্দ। বললে, 'সজ্ঞানে বলছেন, অজ্ঞানেও দু-একবার হয়ে গেছে নাকি আগে ?'

দু' ঠোঁটের কোণ একটু কুঁচকে হাসল সুষীমা, বললে, 'বোধ হয় হয়েছে। একবার তো স্পষ্ট মনে আছে। এত স্পর্ধা যে আপনার কী করে হতে পেরেছিল ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না।'

যেন কতকাল আগেকার কথা। তবু ব্যস্ত হয়ে আনন্দ প্রশ্ন করল, 'কখন ?'

'যখন আপনার বিছানা পেলে শুতাম কিনা জিগগেস করেছিলেন।'

'বটে ? ছি ছি ছি, আমি বড্ড বেশি ক্লামৃজি, অপরিচ্ছন্ন। কিছুতে আমার তর সয় না, কিছুতেই যেন মানায় না গড়িমসি।' যেন অনুতাপে চুল ছিঁড়ছে আনন্দ। 'লোকে কেমন আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে দিয়ে জুড়িয়ে জুড়িয়ে খায়, আমার একেবারে গোগ্রাস। আমার কাছে যেন খাদ্যও ফুরিয়ে যাচ্ছে, খিদেও ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

'শুধু জীবিকার্জনের ক্ষেত্রেই আপনি দ্রুত নন।' স্বর অদ্ভুত গাঢ় করল সুষীমা। যেন নির্মল ব্যঙ্গ নয়, অন্তরের কোনো গভীর খেদ জানাতে চাইছে।

তবুও তা গায়ে মাখল না আনন্দ। বললে, 'একেকজনের একেক রকম ধাত থাকে। আমার একেবারে অদ্ভুতের ধাত। লোকে ঘা মারবার আগে বসে বসে ধীরে সুস্থে তার অস্ত্রে শান দিয়ে নেয়, আর আমি অস্ত্র ধারালো না ভোঁতা বিচার না করেই কোপ বসাই। লোকে ঝোল রান্না করে খায়, আমি ভেজে খেয়ে নিতে পারলেই খুশি। নইলে দেখ না আমি ছাড়া আর কেউ এইটুকু সময়ের মধ্যে তোমার কাছে এত ব্যক্ত এত স্পষ্ট এত নির্লজ্জ হতে পারত ?'

'আমি ছাড়া আর কেউ ছিল নাকি আপনার ?' সুষীমাকে একটু বুঝি রূঢ় শোনাল।

'কেউ না।'

'কেউ আছে নাকি আপনার ?'

'কেউ না।'

'কেউ থাকবে নাকি আপনার ?'

'এইখানে অন্য লোক ঢোঁক গিলত, আমতা আমতা করতে চাইত, ধূসর দার্শনিক হবার চেষ্টা করত। শুধু আমারই উত্তরে দ্বিধা নেই, বাধা নেই, দৈন্য নেই। শুধু আমিই বলতে পারি, তুমিই থাকবে আমার চিরকাল। তুমিই আমার প্রথম, আমার পরম, আমার শেষ। চরম বলতে পারতাম বটে, কিন্তু তুমি হয়তো ভাববে, মেলাবার জন্যেই কথাটা বলেছি। হয়তো তোমার কানে খেলো শোনাত, অর্থের গুরুত্ব দিতে না। তুমিই আমার আদিম। তুমিই আমার অন্তিম।'

'আমার কথা আপনি শুনবেন না ?' চোখে বিষাদ আনল সুষীমা।

'তোমার আবার কথা কী! আমার কথাই শোনো।' আনন্দ ফুটন্ত রক্তে টগবগ করতে লাগল। 'আমার কথাই শোনবার। লোকে কেমন নীরব পূজা-পূজা ভাব নিয়ে থাকতে পারে, কবিতার ভাব, স্তোত্র-মন্ত্রের ভাব। মেয়েদের তাই হয়তো পছন্দ। এই স্তুতি-

প্রস্তুতির ভঙ্গিমা। হাত জোড় করে স্তবের ভঙ্গিতে না দাঁড়িয়ে হাত মেলে ঝাঁপিয়ে পড়তেই আমার সুখ। চুরিও হরণ দস্যুতাও হরণ, তবু আমি পা টিপে-টিপে হাঁটা চোর নই, আমি হাঁকপাড়া ডাকাত। আমি অন্ধকারে নিয়ে যাই না, আমি মশাল জ্বালিয়ে আসি, চিরে-চিরে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে নিয়ে যাই। আমি দুর্ধর্ষ, আমি মুখর, আমি উন্মুক্ত—'

'কিন্তু আমাকে যদি আমার কথাটা বলতে না দেন—' আবার ক্ষীণ প্রতিবাদের সুর আনল সুষীমা।

'তুমি আবার কী বলবে? কথা আমার, ভালোবাসা আমার, আমাকেই বলতে দাও, আমাকেই জ্বলতে দাও। তোমাকে দেখেছি আর তন্মুহূর্তে তোমাকেই ভালোবেসেছি। সিদ্ধান্ত করতে আমার এক পলকও দেরি হয়নি। ঝাঁপ দেওয়া কি নয়, কোপ মারা কি নয়—এই সিদ্ধান্ত করতে করতেই একেকটা লোক অর্ধেক জীবন ফতুর করে দেয়। স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ পেলে শুকনো বারুদের সিদ্ধান্তে আর দেরি কা! চষা-ভেজা মাটির গহ্বরে বীজ পড়লে সিদ্ধান্তই অঙ্কুর। তাই তোমার চোখের হাসির আলো আমার চোখের মণির কালোতে এসে পড়লে সিদ্ধান্তই ভালোবাসা। আর, তোমাকে আগেই তো বলেছি আমার পূজা-পূজা ভাব নয়, আমার পাওয়া-পাওয়া ভাব। আমি রাসের নই, আমি গ্রাসের। তাই এক বেলার ব্যাপারকে এক যুগের করে তুলতে আমি রাজি নই। দীর্ঘ দিন রোগে ভুগিয়ে-ভুগিয়েও মৃত্যু আসে, আবার কখনো আসে আচম্বিতে, খোলা, ভরা দিনের আলোয়। আমিই সেই মহৎ দুর্ঘটনা, আচম্বিত মৃত্যু।'

'তুমি চমৎকার!' উদ্বেল হৃদয়ে বললে সুষীমা। পরে কণ্ঠস্বরে অভিমান মাখাল। বললে, 'কিন্তু এক বেলারই হোক বা এক জন্মেরই হোক, ব্যাপারটা তো একতরফা নয়। তালি তো শুধু এক হাতেই বাজবে না। সুতরাং আমার কথাটাও শুনবে তো?'

যেন নিমেষে হালকা হয়ে গেল আনন্দ। বললে, 'শুনব, এবার শুনব।'

এবার ফিরতে লাগল বাড়ির দিকে। এবং এত সকালেই ফিরতে হচ্ছে দেখে আরাধন আপত্তি শুরু করল। না চড়া হল না বা ভাসানো হল নৌকো। জলে দুটো ঢিল ছুঁড়ে মারলেই বুঝি খেলা হয়? হাত পা ছুঁড়তে লাগল আরাধন। আর কাঁদতে, নালিশ করতে।

'দুই দিক থেকে দুই শিশু যদি অনর্গল বকতে থাকে,' হাসল সুষীমা, 'তাহলে আমার নিজের বক্তব্যটা পেশ করি কখন?'

'আমি শিশু?' রুখে উঠল আনন্দ।

'শিশু ছাড়া আর কি। নিজেও প্রতীক্ষা করবে না, আমাকেও প্রতীক্ষা করতে দেবে না। একমাত্র শিশুই সব মেনে নেয়, লুফে নেয়। নইলে আমাকে যে তুমি মূল্য দিচ্ছ আমার সম্বন্ধে তুমি জানো কী! আমার অতীত সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছ, চেয়েছ জানতে?'

'তুমি হেন মানুষ, তোমার আবার অতীত!' হো-হো করে হেসে উঠল আনন্দ: 'পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি।'

'কেন, আমার বয়েস কম হয়েছে?' আহত হবার ভাব করল সুষীমা। 'আমি বাবার সঙ্গে সঙ্গে শহর মফস্বল ঘুরিনি? এখানে আসবার ঠিক আগে তো কলকাতাতেই ছিলাম আমরা। আমার সঙ্গে আর কোনো ছেলের সম্পর্ক হতে পারে না?'

'কই দেখি?' ঝুঁকে পড়ে সুষীমার চুলের সিঁথির দিকে চোখ ফেলল আনন্দ। বললে, 'এখনো তো কাঁচা মাটির রাস্তা, লাল শুরকি পড়েনি এখনো। গরুর গাড়ি চড়ে আসতে হলে এখনো ঢের দেরি।'

'লাল শুরকি পড়ে পাকা হতে কতক্ষণ। কেন, আর কোনো ছেলে আগে থাকতে ভালোবাসতে পারে না আমাকে?'

'জানা আছে আমার সে সব ভালোবাসা।' কথার সুরে অবজ্ঞা মেশাল আনন্দঃ 'সে সব ঐ গিটারের টুং-টাং, চোরের ফিসফাস, মাছের কাছে বেরালের ছোঁক-ছোঁক।'

'একমাত্র তুমিই ভালোবাসতে পারো।' সপ্রশংস আহ্লাদ সুষীমার চোখে।

'একমাত্র আমিই পারি। আমি ছাড়া আর কে পারবে, কে ধরবে এত ভালোবাসা?' আবার কথায় পেয়ে বসল আনন্দকে। 'আমি সর্বগ্রাসী অর্কেস্ট্রা, সর্বগ্রাসী দস্যুতা, সর্বব্যাপী ভোজ। সর্বভুক বলতে পারো। আগুনের মত, আনন্দের মত। আগুনই শুধু সর্বভুক নয়, আনন্দও সর্বভুক।'

কেমন যেন ভয় করতে লাগল সুষামার।

'বেশ তো, অতীতের যদি কেউ থাকে, বলো তা স্পষ্ট করে।' তীক্ষ্ণ চোখে আনন্দ যেন সুষীমার হৃদয় পর্যন্ত বিদ্ধ করল। 'ঢাক ঢাক গুড়গুড়ের দরকার কী। শুনি ব্যাপারটা।'

দুর্বল রেখায় হাসল সুষীমা। বললে, 'অতীত বলতে না হয় কিছুই নেই কিন্তু ভবিষ্যৎ কি বিপন্মুক্ত?'

'শিশু ছাড়া আর কী!' নীরেখমুখে আনন্দ বললে, 'কেন, ভবিষ্যতে ভাবনা কী?'

'যদি ভবিষ্যতে কেউ আসে?'

'বা, আমি আছি না?' পথ জুড়ে যেন বিশাল স্ফীত হয়ে দাঁড়াল আনন্দ।

'হ্যাঁ, তুমি আছ।' পরিপূর্ণ নির্ভর নিয়ে বললে সুষীমা, 'কিন্তু আমাকে যে তুমি ঘিরে রাখবে বাঁচিয়ে রাখবে তার জন্যে একটি সুদৃঢ় দুর্গ চাই। একটি ভালো চাকরি চাই—এবং তা এক্ষুনি-এক্ষুনি। যত শীগ্‌গির সম্ভব।'

'চাকরি !' স্টিমারের চাকা যেন হঠাৎ চড়ায় ঠেকে গেল।

'নইলে আমাকে খাওয়াবে কী, পরাবে কী, সাজাবে-বাজাবে কী !'

স্তব্ধ হয়ে গেল আনন্দ।

এবার বুঝি সুষীমার বলবার পালা। আর সেটা কল্পনার সোনার রঙে নয়, বাস্তবের মৃত্তিকার রঙে।

'দেখতেই পাচ্ছ, বাবা-মা আর পড়াবেন না আমাকে। বসিয়ে রেখেছেন। বিয়ে দিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন। পাত্র খুঁজে ফিরছেন। তৈরি পাত্র। আধুনিক বাপ-মায়ের কাছে মাইনের দিক থেকে যত মোটা, পাত্রের দিক থেকে তত তৈরি।' সুষীমার বুক দুরু-দুরু করতে লাগল। 'অমন একজন হৃষ্টপুষ্ট যদি এনে উপস্থিত করান তা হলেই বিপদ।'

'কেন, বিপদ কেন ? তাকে বাতিল করে দেবে। অপেক্ষা করবে আমার জন্যে।' যেন গায়ে লাগল না এমনি করে বললে আনন্দ।

'সে বিপদ আসবার আগে তুমি আমাকে নিয়ে চলো না।' বললে সুষীমা।

যেন ভরা নদীতে খোলা পালে অনুকূল হাওয়া লাগল। উত্তেজিত স্বরে বললে আনন্দ, 'চলো না, চলো না এখুনি তোমাকে নিয়ে যাই।'

যেন গায়ে লাগল না এমনি করে বললে।

'নৌকো করে নিয়ে যেও।' হাততালি দিয়ে উঠল আরাধন। 'ঐ অনেকদূর, কলকাতা, নয় বোম্বাই, যেখানে নদী সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে সেইখানে।'

'হ্যাঁ, সেইখানে।' আবৃত্তি করল আনন্দ। আরাধনকে জিগগেস করলে, 'তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে ?'

'না, বাবা, অতদূর যেতে আমার ভয় করবে।' বললে আরাধন।

'অন্ধকার হয়ে আসছে। অন্ধকারে মায়ের জন্যে মন কেমন করবে। আমি বাড়ি যাব।'

'হ্যাঁ, সেইখানে।' এবার আবৃত্তি করল সুষীমা। আনন্দের চোখের মধ্যে তাকাতে চেষ্টা করল, অন্ধকারে মর্মবিন্দু নির্দিষ্ট করতে পারল না। তবু বললে, 'সেই সেইখানটা কোথায়?'

সমস্ত ধূ-ধূ করছে আনন্দের সামনে, তবু জোর দেখিয়ে সে বললে, 'দূরে-কাছে সে একটা কিছু হবেই। আগে পথে তো বেরিয়ে পড়ি। পথই পথ দেখাবে।'

'তুমি আইনের ছাত্র, যুক্তি-তর্কই তোমার খাদ্য-পানীয়। তাই ফাঁকা কথা তোমার সাজে না। তুমিই বলো, সাজে?'

'না, না, যুক্তি-তর্কের দরকার আছে বৈ কি। কিন্তু ভালোবাসাকে যুক্তি-তর্ক কী করবে?' হেসে উড়িয়ে দিল একশ্বাসে।

'তীর্থে গিয়ে প্রথমেই একটা ডেরা নিতে হয়।' শান্ত স্বরে বললে সুষীমা, 'ডেরা ঠিক করে পরে বেরুতে হয় দর্শনে। তেমনি, ধরণীর এক কোণ হয়তো চলে কিন্তু একটুকু বাসার দরকার। আর, ধন নয় মান নয়, এ অতি অবাস্তব ব্যবস্থা। একটুকু ধন ও একটুকু মানও চাই বৈ কি। দেহধারণ করবার মত কিছু ধন ও মানুষ হয়ে বাঁচবার মত কিছু মান। তাই সম্প্রতি, যত শীগগির পারো, একটি চাকরি যোগাড় করো আর একটু মাথা গোঁজবার আশ্রয়।'

'বাড়ি তো আমার এখানে আছেই।'

'তা তো আছেই।' সানন্দে সায় দিল সুষীমা। 'কিন্তু আমাকে তুমি একটি আলাদা সংসার দেবে না? যদি তুমি কলকাতায় বা আর-কোথাও চাকরি করো আমি থাকতে পারব না তোমার সঙ্গে? তা হলে আর সুখ কী?'

'সুতরাং সর্বাগ্রেই একটি চাকরি।'

'হ্যাঁ, দেড়শো দুশো, আড়াই শো—খুব একটা জমকালো কেউ আশা করে না। মধ্যবিত্ত বাঙালী ছেলের পক্ষে যা আশা করা যায় তেমনি ধরো। কি পারবে না যোগাড় করতে ?'

'খুব পারব।' গায়ে লাগল না আনন্দর।

'বা, তা হলে আর কথা নেই। যত বড় দুর্দান্ত শত্রু আসুক লড়তে পারব নখে-দাঁতে। আইন, আইন কি ভালো নয় ? খুব ভালো, খুব জমজমাট। দেশের সব নেতা-মাথা তো উকিলই। কিন্তু তোমার পাশ করে উকিল হয়ে পকেট-ভর্তি টাকা আনতে অনেক-অনেক দেরি। বলো, তুমিই বলো, আমি কি ভুল বলছি ? ততদিনে ঘটোৎকচ নির্ঘাত এসে পড়বে।' হাসল সুষীমা। 'ঘটোৎকচকেই আগে বধ করা দরকার। অন্য শত্রু আস্তে আস্তে।'

'বুঝেছি এতক্ষণে। তোমার বিপদ যখন সন্নিকট তখন কালো কোট অপ্রকট।' রসিকতা করবারও মেজাজ পেল আনন্দ: 'তখন বুশ-শার্ট পরে কোনো একটা আপিসে-টাপিসে তড়িঘড়ি ঢুকে পড়া। তাই তো ?'

'হ্যাঁ, তাই। শুধু বি-এ পাশ করেও তো কত লোকে ভালো চাকরি পায়।'

'কত !' তাচ্ছিল্য করে বললে আনন্দ।

'তুমিও পাবে। তুমি কি তাদের চেয়ে কম ? তোমার চোখে-মুখে কত শক্তি। তুমি পারবে মাটি খুঁড়ে সোনা বের করতে। তুমি অসাধ্যসাধক।'

'তুমি যদি বলো নিশ্চয়ই পারব। আমার মধ্যে শক্তি কী ! শক্তি তোমার মধ্যে।'

'প্রথম একটা চলনসই চাকরি নিয়ে গোড়াপত্তন করা। বেশ তো, সেই সঙ্গে না হয় ল পড়বে। আমিও পড়ব, বি-এ পাশ করব, বলো

তো বি-টি। আমিও চাকরি করব। তুজনের আয়ে সংসার লক্ষ্মীমন্ত হবে।'

যেন সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। এখন পাঁজিপুঁথি দেখে দিনক্ষণ বার করা শুধু বাকি।

'ব্যস, এই কথা? আমি তো কালই যাচ্ছি কলকাতা, সমস্ত শহর তোলপাড় করে ছাড়ব। তোমার দেখা পেতে পারি, তোমার ভালোবাসা পেতে পারি—আর একটা চাকরি পাব না?' হঠাৎ সুষীমার কানের কাছে মুখ এনে আনন্দ ফিসফিস করে শুধোল: 'কতদিন সময় দিতে পারো?'

'বলতে ইচ্ছে করছে এক দিন, কিন্তু,' কুণ্ঠা এসে মুখ চেপে ধরল সুষীমার: 'ধরো তিন মাস। আশা করি তিন মাসের মধ্যেই দেখা দেবে না ঘটোৎকচ।'

'তিন মাস।' লাফিয়ে উঠল আনন্দ। 'এ অনেক, অনেক সময়। তিন মাসে তিন ভুবন ঘুরে আসা যায়। কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এর চেয়েও কত কম সময়ের মধ্যে হয়ে গিয়েছে।'

যেন বেশি সময় দিয়ে ফেলেছে এমনি ভয়-ভয় করতে লাগল সুষীমার। সংশোধন করতে চাইল আগের কথাটার। তুর্বল স্বরে বললে, 'তিন মাস যদি তিন দিন করতে পারো তো আরো ভালো।'

'তিন মুহূর্ত কেন নয়!'

'হ্যাঁ, তুরন্ত দ্রুত। ব্যাধের শর কখন অতর্কিতে এসে পড়ে তার ঠিক কি!'

'ব্যাধের সব শরই বিদ্ধ করে না। ছোঁড়া ব্যাপারটার মধ্যেই এমন একটু ভুল থেকে যায় যে লক্ষ্যে এসে পৌঁছয় না কিংবা পেরিয়ে যায় কান ঘেঁষে। আর যে মর্মমূলে বিদ্ধ হবার সেই ঠিক হয়।' দৃপ্ত ভঙ্গি করল আনন্দ। বললে, 'এখন এক কাজ করো।'

বাড়ির কাছে প্রায় এসে পড়েছে, তবু ভয় করতে লাগল সুষীমার।

'কী কাজ ?'

'তোমার চুলটা খুলে ফেল।' আনন্দ নিজেই সুষীমার খোঁপায় হাত রাখতে যাচ্ছিল, হাত গুটিয়ে নিল। বললে, 'চুলে হাত দিলে গায়ে হাত দেওয়া হবে নাকি ?'

মাথার উপর ত্রস্ত হাত রেখে খোঁপাটাকে বাঁচাল সুষীমা! হাত-প্যাঁচে জড়ানো আলগা খোঁপা। ফাঁসে ঠিক হাত পড়লেই খুলে ভেঙে একপিঠ হয়ে যাবে। সুষীমা একটু সরে গিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই হবে। চুল কি গা নয় ?'

'তেমনি যদি তোমার শাড়িটা ধরি, মানে যদি তোমার আঁচলের প্রান্তটা ধরি, তাহলেও তোমার গায়ে হাত দেওয়া হয়ে যাবে ?'

'নিশ্চয়ই ?' মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল সুষীমা। 'গাছের পাতা ধরলে কি গাছকেই ধরা হল না ?'

'ঠিকই তো। এইখানে এ মাটিতে যদি পাত রেখে ভাত খাই তাহলে তো সমস্ত পৃথিবীই এঁটো হয়ে গেল।' বাড়ি ফেরার পথ ফুরিয়ে এল, তাই আস্তে আস্তে পা ফেলতে লাগল আনন্দ। বললে, 'কত সময় তো এমনি হাত লেগে, দ্রুত একটু নড়াচড়ায় খুলে যায় চুল ? আবার দুহাতে জড়িয়ে নিয়ে ঘাড় ঝাড়া দিয়ে প্যাঁচ কষে! তেমনি ঘটতে পারে না একটা দুর্ঘটনা ?'

'না।' গম্ভীর হল সুষীমা। 'আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরে গিয়ে চুল বাঁধতে হবে। মা বাড়ি নেই, থাকলে এখনো খোলা চুলে আছি দেখে বকাঝকা করতেন। কিন্তু কেন ?' কৌতূহলের নিবৃত্তি চাইছে সুষীমা। 'চুল খুলে দিলে কী হবে ?'

'আমি দেখব।'

'কী দেখবে ?'

'তুমি এক ঢাল চুল নিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে, মস্ত খোঁপা থেকে ভেঙে-পড়া রাশীভূত চুল, আর আমি চোখ ভরে দেখব। যেমন এক দিগন্ত দেখে আরেক দিগন্তের মেঘকে।'

'এতে অবাক হবার কী আছে?' নিজেরও অগোচরে চুলে হাত রাখল সুষীমা।

'সেই মুক্তকেশে তোমার বিদ্রোহের ছবি, বিপ্লবের ছবি দেখব।'

'বিপ্লবের ছবি!'

'হ্যাঁ, গ্রন্থিমোচনের, বন্ধনমোচনের ছবি।'

কেমন ভয় করতে লাগল সুষীমার। ঝাঁপ-দেওয়া বাঘের মতন দেখতে হয়েছে যেন আনন্দকে। চুলে দু হাত রেখে বললে, 'সে আবার কী।'

'শুধু সংস্কারের বন্ধন নয়, রহস্যেরও বন্ধন। তুমি একে-একে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতে-করতে মুক্ত হয়ে নির্মল হযে উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়াবে আমার সামনে—আমি দেখব—দেখব সেই অদৃশ্যকে।'

'তিন মাস পরে—' বলেই আরাধনকে দু হাতে বুকে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে ছুট দিল সুষীমা।

স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল আনন্দ। আশা করল, যেহেতু ছুটেছে, খোঁপাটা কালো জলপ্রপাতের মত ভেঙে পড়বে।

কিন্তু হুঁশিয়ার সুষীমা। ইতিমধ্যে দু হাত দিয়ে খোঁপার ফাঁসটা সে আরো আঁট করে নিয়েছে। দৃঢ়তর করেছে গ্রন্থি। যাতে ছুটতে গেলেও যেন বিশৃঙ্খল না হয়। বিবন্ধন না হয়।

রাত্রে একবার মনে হয়েছিল, ও-বাড়ির এদিককার জানলাটা বুঝি খোলা। অন্ধকারে দৃষ্টি স্থির করল আনন্দ। হ্যাঁ, সুষীমাই এসে দাঁড়িয়েছে, আর, সন্দেহ কী, তার দিকে পিঠ দিয়ে। কিন্তু তার গগনছড়ানো এলোচুল কই?

না, সুন্দর একটি খোঁপায় সে সজ্জিত হয়ে স্তূপীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকান ছবির ম্যাগাজিনগুলো ডাকতে লাগল তাকে। ফিরেও তাকাল না। না, দড়ি দিয়ে বেঁধে জঞ্জালের পিণ্ডটাকে তক্তপোশের নিচে চালান দিলে। কাল সকালে কলকাতা যাবার আগেই ফেলে দিতে হবে আঁস্তাকুড়ে। নয়তো বিক্রি করে দিয়ে আসবে মুদিখানায়। মুদিখানায় বিক্রি করে দিয়ে আসাই ভালো। পাওয়া যাবে দুটো পয়সা।

একটার পর একটা সিগারেট পোড়াতে লাগল আনন্দ।

না, কাগজের ছবি নয়, রক্তমাংসের জীবন্ত-ধাবন্ত চলন্ত-জ্বলন্ত শরীর। কী তার শক্তি, কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার রহস্য? শুধু রক্তের জিজ্ঞাসা নয়, আত্মার জিজ্ঞাসা। বিনিদ্র শয্যায় ছটফট করতে লাগল। হ্যাঁ, শুধু গোচরের ডাক নয়। গভীরের ডাক। উত্তেজনায় অগ্নিদাহন নয়, শীতলতায় অবগাহন। আনন্দর মনে হল সমস্ত উত্তরকে যেন মৌনের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। সমস্ত অর্থকে আড়াল করে রাখা হয়েছে এক আপাতদৃশ্য অনর্থকতায়। খোলো, খুলে ফেল সমস্ত আবরণ অবগুণ্ঠন। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেল। বিছানার চাদরের কোণটা গুটিয়ে-গুটিয়ে নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরল আনন্দ। তুমি এমনি করে রহস্যে গুটিয়ে থেকো না, ব্যাখ্যায় প্রসারিত হও, দূর করে দাও তোমার কৃত্রিমের আবর্জনা, তোমার কপটের আচ্ছাদন। আমাকে দেখতে দাও, জানতে দাও, তুমি কে, তুমি কী, তুমি কোথায়?

তো বি-টি। আমিও চাকরি করব। দুজনের আয়ে সংসার লক্ষ্মীমন্ত হবে।'

যেন সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। এখন পাঁজিপুঁথি দেখে দিনক্ষণ বার করা শুধু বাকি।

'ব্যস, এই কথা? আমি তো কালই যাচ্ছি কলকাতা, সমস্ত শহর তোলপাড় করে ছাড়ব। তোমার দেখা পেতে পারি, তোমার ভালোবাসা পেতে পারি—আর একটা চাকরি পাব না?' হঠাৎ সুষীমার কানের কাছে মুখ এনে আনন্দ ফিসফিস করে শুধোল: 'কতদিন সময় দিতে পারো?'

'বলতে ইচ্ছে করছে এক দিন, কিন্তু,' কুণ্ঠা এসে মুখ চেপে ধরল সুষীমার: 'ধরো তিন মাস। আশা করি তিন মাসের মধ্যেই দেখা দেবে না ঘটোৎকচ।'

'তিন মাস।' লাফিয়ে উঠল আনন্দ। 'এ অনেক, অনেক সময়। তিন মাসে তিন ভুবন ঘুরে আসা যায়। কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এর চেয়েও কত কম সময়ের মধ্যে হয়ে গিয়েছে।'

যেন বেশি সময় দিয়ে ফেলেছে এমনি ভয়-ভয় করতে লাগল সুষীমার। সংশোধন করতে চাইল আগের কথাটার। দুর্বল স্বরে বললে, 'তিন মাস যদি তিন দিন করতে পারো তো আরো ভালো।'

'তিন মুহূর্ত কেন নয়!'

'হ্যাঁ, দুরন্ত দ্রুত। ব্যাধের শর কখন অতর্কিতে এসে পড়ে তার ঠিক কি!'

'ব্যাধের সব শরই বিদ্ধ করে না। ছোঁড়া ব্যাপারটার মধ্যেই এমন একটু ভুল থেকে যায় যে লক্ষ্যে এসে পৌঁছয় না কিংবা পেরিয়ে যায় কান ঘেঁষে। আর যে মর্মমূলে বিদ্ধ হবার সেই ঠিক হয়।' দৃপ্ত ভঙ্গি করল আনন্দ। বললে, 'এখন এক কাজ করো।'

বাড়ির কাছে প্রায় এসে পড়েছে, তবু ভয় করতে লাগল সুষীমার।

'কী কাজ ?'

'তোমার চুলটা খুলে ফেল।' আনন্দ নিজেই সুষীমার খোঁপায় হাত রাখতে যাচ্ছিল, হাত গুটিয়ে নিল। বললে, 'চুলে হাত দিলে গায়ে হাত দেওয়া হবে নাকি ?'

মাথার উপর ত্রস্ত হাত রেখে খোঁপাটাকে বাঁচাল সুষীমা। হাত-প্যাঁচে জড়ানো আলগা খোঁপা। ফাঁসে ঠিক হাত পড়লেই খুলে ভেঙে একপিঠ হয়ে যাবে। সুষীমা একটু সরে গিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই হবে। চুল কি গা নয় ?'

'তেমনি যদি তোমার শাড়িটা ধরি, মানে যদি তোমার আঁচলের প্রান্তটা ধরি, তাহলেও তোমাব গাযে হাত দেওয়া হয়ে যাবে ?'

'নিশ্চযই ?' মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল সুষীমা। 'গাছের পাতা ধরলে কি গাছকেই ধরা হল না ?'

'ঠিকই তো। এইখানে এ মাটিতে যদি পাত রেখে ভাত খাই তাহলে তো সমস্ত পৃথিবীই এঁটো হয়ে গেল।' বাড়ি ফেরার পথ ফুরিযে এল, তাই আস্তে আস্তে পা ফেলতে লাগল আনন্দ। বললে, 'কত সময় তো এমনি হাত লেগে, দ্রুত একটু নড়াচড়ায় খুলে যায় চুল ? আবার দুহাতে জড়িয়ে নিয়ে ঘাড় ঝাডা দিয়ে প্যাঁচ কষে! তেমনি ঘটতে পারে না একটা দুর্ঘটনা ?'

'না।' গম্ভীর হল সুষীমা। 'আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরে গিয়ে চুল বাঁধতে হবে। মা বাড়ি নেই, থাকলে এখনো খোলা চুলে আছি দেখে বকাঝকা করতেন। কিন্তু কেন ?' কৌতূহলের নিবৃত্তি চাইছে সুষীমা। 'চুল খুলে দিলে কী হবে ?'

'আমি দেখব।'

'কী দেখবে ?'

'তুমি এক ঢাল চুল নিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে, মস্ত খোঁপা থেকে ভেঙে-পড়া রাশীভূত চুল, আর আমি চোখ ভরে দেখব। যেমন এক দিগন্ত দেখে আরেক দিগন্তের মেঘকে।'

'এতে অবাক হবার কী আছে?' নিজেরও অগোচরে চুলে হাত রাখল সুষীমা।

'সেই মুক্তকেশে তোমার বিদ্রোহের ছবি, বিপ্লবের ছবি দেখব।'

'বিপ্লবের ছবি!'

'হ্যাঁ, গ্রন্থিমোচনের, বন্ধনমোচনের ছবি।'

কেমন ভয় করতে লাগল সুষীমার। ঝাঁপ-দেওয়া বাঘের মতন দেখতে হয়েছে যেন আনন্দকে। চুলে দু হাত রেখে বললে, 'সে আবার কী!'

'শুধু সংস্কারের বন্ধন নয়, রহস্যেরও বন্ধন। তুমি একে-একে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতে-করতে মুক্ত হয়ে নির্মল হযে উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়াবে আমার সামনে—আমি দেখব—দেখব সেই অদৃশ্যকে।'

'তিন মাস পরে—' বলেই আরাধনকে দু হাতে বুকে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে ছুট দিল সুষীমা।

স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল আনন্দ। আশা করল, যেহেতু ছুটেছে, খোঁপাটা কালো জলপ্রপাতের মত ভেঙে পড়বে।

কিন্তু হুঁশিয়ার সুষীমা। ইতিমধ্যে দু হাত দিয়ে খোঁপার ফাঁসটা সে আরো আঁট করে নিয়েছে। দৃঢ়তর করেছে গ্রন্থি। যাতে ছুটতে গেলেও যেন বিশৃঙ্খল না হয়। বিবন্ধন না হয়।

রাত্রে একবার মনে হয়েছিল, ও-বাড়ির এদিককার জানলাটা বুঝি খোলা। অন্ধকারে দৃষ্টি স্থির করল আনন্দ। হ্যাঁ, সুষীমাই এসে দাঁড়িয়েছে, আর, সন্দেহ কী, তার দিকে পিঠ দিয়ে। কিন্তু তার গগনছড়ানো এলোচুল কই?

না, সুন্দর একটি খোঁপায় সে সজ্জিত হয়ে স্তূপীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকান ছবির ম্যাগাজিনগুলো ডাকতে লাগল তাকে। ফিরেও তাকাল না। না, দড়ি দিয়ে বেঁধে জঞ্জালের পিণ্ডটাকে তক্তপোশের নিচে চালান দিলে। কাল সকালে কলকাতা যাবার আগেই ফেলে দিতে হবে আঁস্তাকুড়ে। নয়তো বিক্রি করে দিয়ে আসবে মুদিখানায়। মুদিখানায় বিক্রি করে দিয়ে আসাই ভালো। পাওয়া যাবে ত্নটো পয়সা।

একটার পর একটা সিগারেট পোড়াতে লাগল আনন্দ।

না, কাগজের ছবি নয়, রক্তমাংসের জীবন্ত-ধাবন্ত চলন্ত-জ্বলন্ত শরীর। কী তার শক্তি, কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার রহস্য? শুধু রক্তের জিজ্ঞাসা নয়, আত্মার জিজ্ঞাসা। বিনিদ্র শয্যায় ছটফট করতে লাগল। হ্যাঁ, শুধু গোচরের ডাক নয়। গভীরের ডাক। উত্তেজনায় অগ্নিদাহন নয়, শীতলতায় অবগাহন। আনন্দর মনে হল সমস্ত উত্তরকে যেন মৌনের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। সমস্ত অর্থকে আড়াল করে রাখা হয়েছে এক আপাতদৃশ্য অনর্থকতায়। খোলো, খুলে ফেল সমস্ত আবরণ অবগুণ্ঠন। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেল। বিছানার চাদরের কোণটা গুটিয়ে-গুটিয়ে নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরল আনন্দ। তুমি এমনি করে রহস্যে গুটিয়ে থেকো না, ব্যাখ্যায় প্রসারিত হও, দূর করে দাও তোমার কৃত্রিমের আবর্জনা, তোমার কপটের আচ্ছাদন। আমাকে দেখতে দাও, জানতে দাও, তুমি কে, তুমি কী, তুমি কোথায়?

চার

নিচে ছোট ভাই বিষাদ কাঁদছে আর কালীপদ, মেজদা, তাকে চাপড়াচ্ছে দু হাতে।

কী ব্যাপার ?

দ্রুত নেমে গেল আনন্দ।

বিষাদ, বারো-তেরো বছরের ছেলে, সবচেয়ে ছোট বলে, কিছু অসুবিধে তো তার আছেই ; তার সব চেয়ে বড় অসুবিধে সম্পর্কে ছোট বলে। তাই কালীপদই মারছে একতরফা আর বিষাদ শুধু ঠেকিয়ে চলেছে যথাসাধ্য। আর যথারীতি কাঁদছে, চেঁচাচ্ছে, প্রতিবাদ করছে। যদি তার এই সম্পর্কের ছোটত্ববোধটা না থাকত তা হলে সে অমন নিষ্ক্রিয় থাকত না, দু-একটা কোন না ঢিল-ডাণ্ডা নিক্ষেপ করত। কালীপদ বড়ত্বের রথে চড়ে আছে বলেই তার বেশি সুবিধে। বিষাদকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়াবার কেউ নেই।

আনন্দ কালীপদকে এক হাতের জোরে দূরে ঠেলে দিয়ে আরেক হাতে বিষাদকে মুক্ত করে নিল।

'তুই আমাকে ঠেলে দিলি যে বড় ?' কালীপদ এবার আনন্দর দিকে তেরিয়া হল।

'তোমাকে না সরিয়ে দিলে ওকে ছাড়িয়ে নিই কি করে ? কী হয়েছে ?'

'কী হয়েছে !' ভেঙচে উঠল কালীপদ। 'সব আগে না জেনে না শুনেই ওর পক্ষ নিচ্ছিস কোন হিসেবে ?'

ও ঠায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে সেই হিসেবে। মারটা তো আগে বন্ধ হোক, তার পরে দেখব কোথায় কার অপরাধ।'

'মুখ সামলে কথা বলিস বলছি।' কোমরে হাত রাখল কালীপদ। 'কোথায় কার অপরাধ! দেখনেওয়ালা এসেছেন। নির্লজ্জ কোথাকার!'

'তুমি বড় বলেই তোমার কোনো অপরাধ নেই? অনুমান সঙ্গত হবে না। আমি নির্লজ্জ কিনা সে ঝগড়া পরে হবে। আগে বিষাদের সঙ্গে কী নিয়ে লেগেছে সেইটে জানি। কী হয়েছে?' এবার বিষাদকেই প্রশ্ন করল আনন্দ।

কেঁদে-কেটে থেমে-গিলে বিষাদ যা বললে তা প্রায় নিত্যিকার ঘটনা। কিন্তু আজ তাতে মিশছে একটু অপ্রত্যাশিতের রঙ। সেইটেই খেপিয়েছে কালীপদকে।

'সকাল থেকে উঠে পড়তেই বসতে পারছি না। একটু পড়ছি অমনি একটা ফরমাশ। সেই কোন ভোরে ফুল কুড়িয়ে এনেছি, পুজোয় বসে বললে, যথেষ্ট হয়নি, আজ নাকি পাঁজিতে কোন তিথি, বেশি ফুল লাগবে। পড়া ছেড়ে উঠে সেই মল্লিকদের বাড়ি থেকে চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে করে নিয়ে এলাম কটা ফুল। আবার বসেছি, বললে, যা একটা ব্লেড কিনে নিয়ে আয়। মোড়ের স্টেশনারি দোকান থেকে এক ছুটে কিনে আনলাম ব্লেড। পড়ছি, জিগগেস করল, জুতোয় কালি দিয়ে রেখেছিস? বললাম, আপিস বেরুতে তো তোমার এখনো দেরি আছে, সময়-সময় ঠিক দিয়ে দেব।

'কী মুখে-মুখে তর্ক করছিস, এখুনি দিয়ে দে বলছি। তক্ষুনি দিয়ে দিলাম কালি। তারপর পড়ায় মন একটু বসেছে কি না বসেছে, অমনি হুকুম হল, ডাইং ক্লিনিং থেকে আমার শার্টটা নিয়ে আয়। আমি বললাম এক বারে বলতে পারো না? যখন ব্লেড আনলাম তখন বললে তখনই তো নিয়ে আসতে পারতাম শার্ট—'

'একবারে বলতে স্মরণশক্তি চাই তো।' টিপ্পনী কাটল আনন্দ।

'শুধু তাই বলেছিস ? আর কিছু বলিস নি ?' কালীপদ আবার লাফ দিয়ে উঠল।

'বলেছি, আমি পারব না। তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে এস।' বিষাদ চোখ মুছতে-মুছতে বললে।

কালীপদ হুঙ্কার করে উঠল ঃ 'শুধু এইটুকু ?'

'তুমি এসে আমার কান ধরলে। আমি তখন বললাম, কান ছাড়ো বলছি, আমি কি তোমার চাকর ? তুমি তখন তোমার শক্ত হাতের মুঠিতে আমার চুল ধরে টানলে। আমি রাগ করে—কার না এতে রাগ হয় শুনি ? ডাইং ক্লিনিং-এর রসিদটা ছিঁড়ে ফেললাম। তার পরে—'

'উটের পিঠে শেষ খড় চাপালে উটও বিদ্রোহী হয়।' বললে আনন্দ ঃ তারপর কালীপদর দিকে তাকিয়ে বললে, 'ছেলেটাকে পড়তে দেবে তো ? না কি চাকর বানিয়ে রাখলেই চলবে ?'

'দাদার ফরমাশ খাটা কি চাকর বনা ?' কালীপদ গজরাতে লাগল।

'তার পর স্নানের আগে গায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে।' বললে বিষাদ। 'এখানে ডল ওখানে মল, এখানে কিল মার ওখানে চিমটি কাট নানান রকমের দলাই-মলাই। আমার হাত ব্যথা হয়ে যায় তবু ছাড়ান নেই। এদিকে পড়া হয় না, ওদিকে দেরি হয়ে যায় ইস্কুলে—' কান্নায় ফেটে পড়তে লাগল বিষাদ।

'এ চাকরেরও অধম। চাকরের কানে দেখো না হাত দিয়ে।' বললে আনন্দ।

'সে আমি বুঝব। তোর কাছ থেকে আমার পরামর্শ নিতে হবে না।' কালীপদর উত্তর।

'নিলে ক্ষতি নেই।' বিম্নাদের হাত ধরে নিজের কাছে টেনে আনল আনন্দ। বললে, 'যখন ও বললে, আমি কি তোমার চাকর? তখন কেন বললে না, না, তুই আমার ছোট ভাই। কেন ওকে মিষ্টি কথায় ভোলালে না? কেন বললে না, তখন তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গিয়েছিল, এক সঙ্গে বলিনি, এখন আরেকবার যা লক্ষ্মীটি—বড্ড জরুরি—'

'চুপ কর।' গর্জন ছাড়ল কালীপদ। 'কখন মারতে হবে কখন মিষ্টি কথা বলতে হবে এ তোকে না শেখালেও চলবে। আমি খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি, আমি দেখছি শুনছি আমি বুঝব।'

'তুমি খাওয়াচ্ছ-পরাচ্ছ মানে? স্তব্ধ হল আনন্দ।

'শুধু ছোটটাকে নয়, মূর্তিমন্ত ঐ উটকে।'

'তুমি উট কাকে বলছ?' এক পা এগুবে না পিছুবে ঠিক করতে পারছে না আনন্দ।

'মরুভূমির উট বাঙলা দেশে পাব কোথায়?' কালীপদর জিভ ঝাল-নুন অজস্র বর্ষণ করতে লাগল। 'বেকারির মরুভূমিতে যে মানুষ গলা উঁচু করে ঘুরে বেড়ায় সেই নির্লজ্জকে।'

'তার মানে বলতে চাও, তুমি আমাকেও খাওয়াচ্ছ-পরাচ্ছ। মানে যখন মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে এখানে আসি ছুটিছাটায়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি স্মরণশক্তি দেখাতে এসেছেন। সব ঘিটুকু নিজেরা খেয়ে নিলে আমার জন্য থাকে কী! স্মরণশক্তি হবে কোত্থেকে?'

'কেন, আমাদের বাবা নেই? বাবার পেনসন নেই?'

'পেনসন না একেবারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক! ছাপ্পান্ন টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা। একেবারে ঢালা নেমন্তন্ন। শোনপুরের রেলস্টেশন।'

'যাই হোক, বাবা যতদিন আছেন—'

'না আমি যত দিন আছি—' ত্রিদিববাবু পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'আমার পেনসনে শুধু আমারই ভরণপোষণ হচ্ছে। আর সকলের পালক-পোষক কালীপদ।' এবং পরে আরেকটু জুড়লেন : 'হরিপদ।'

'এ কথা বললে চলবে কেন?' আনন্দের স্বর গাঢ় হয়ে এসেছে। 'আমি উট হই কি ঝুট হই, আমার কথা আলাদা! কিন্তু বিষাদ যতদিন নাবালক ততদিন আপনি বেঁচে থাকতে ওর মালিক আপনি, দাদারা নয়। তাই ওকে উনি খাওয়াচ্ছেন-পরাচ্ছেন এই অন্যায় দম্ভ যেন উনি না করেন।' বিষাদকে ঠেলা মেরে এগিয়ে দিল ত্রিদিবের কাছে। বললে, 'যা, বাবার কাছে যা, বাবাকে ধরে থাক।'

ত্রিদিবের কাছে যেতে ত্রিদিব নতুন করে তিরস্কার করে উঠলেন : 'যা যা, যে বড় ভাইয়ের আদেশ পালন করে না সে কি একটা মানুষ? হনুমানের পরে আবার জাম্বুবান এসে জুটেছে। কোথায় ছোট ভাইকে বাধ্যতা শেখাবে, তা নয়, বিদ্রোহ শেখাচ্ছে! ঘরে ভাত নেই দোরে চাঁদোয়া। যা যা পড়তে বোসগে যা।' বিষাদকে ঠেলে দিলেন পড়ার ঘরের দিকে, পরে ফের বললেন, 'আমিই যাচ্ছি ডাইং ক্লিনিঙে।' রসিদের ছেঁড়া টুকরো দুটো জুড়তে বসলেন নিজের হাতে।

বাবা মেজদার পক্ষে। তাঁর বাড়ি, মেজদার চাকরি তাঁরা এক পক্ষে তো হবেনই। বিষাদ আর সে একদিকে। নাবালকের তবু বাবা আছে, এখনো পর্যন্ত আছে। আনন্দই ছন্নছাড়া। আনন্দেরই কেউ নেই।

কেউ নেই!

এ কি বলা যায় আর আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে? বুক ভরে নিশ্বাস নিতে নিতে?

'তুমি আজই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছ?' ঘরে ঢুকে করবী জিগগেস করলে।

'হ্যাঁ, আজই কি, এখুনি। আমার ছুটি ফুরিয়ে গেল না?'

'তোমার ক্লাস তো বিকেলে। সকালের দিকেই যাচ্ছ কেন?' করবী করুণ করে তাকাল।

'যত শিগ্‌গির যাওয়া যায়। অশুভস্য শীঘ্রং। অশুভ যত শিগ্‌গির দূর হয়।' আনন্দ হাসল।

কী বলবে সহসা যেন বুঝতে পারল না করবী। বললে, 'স্নান করেছ?'

'না। এমনিতেই স্নিগ্ধ আছি।'

'না, স্নান করে নাও। খাবে এস। আমাব রান্না হয়ে গিয়েছে। ভাত বাড়ছি আমি।' বলেই করবী চলে যাবার উদ্যোগ করল। যেন তাব এ কথার পর আর কোনো বক্তব্য না থাকে।

'বৌদি,' ডাকল আনন্দ। 'শোনো। আমি খাবো না। এর পর খেতে বোলো না আমাকে। তুমি অন্তত বোলো না। যদিও তুমি শেষ পর্যন্ত ওদেরই দলে তবু অন্তত এখন, এই মুহূর্তে, একটুখানির জন্যে হলেও তুমি আমার পক্ষে থেকো।'

মমতার ছায়া পড়ল করবীর চোখে। বললে, 'একসঙ্গে থাকতে গেলে এমন অনেক অনেক কথা হয়, চোখের সামনে দেখছ না আমাকে?'

সহ্যের নিস্তব্ধ প্রতিমা, দেখছে বৈ কি আনন্দ। একটি অবিবেকী ক্ষুধার্ত পুরুষ একটা নারীদেহকে নিঃশেষে নির্মাংস কঙ্কাল করে ছেড়েছে। কোনো রহস্যের ইঙ্গিতটুকু, অবকাশটুকুও আর রাখেনি। নিচের কয়লা উঠে গেলে উপর থেকে ফাটা মাটির যে ধস নামে তেমনি দীনবিদীর্ণ চেহারা। অপমানের ভাষা তো আছেই, কখনো-কখনো বা নিষ্করুণ নিগ্রহ, তবু কোথায় যেন একটা আপোষ আছে, সব সশরীরে মেনে নিচ্ছে করবী। সেই আপোষ বোধহয় তার নিশ্ছিদ্র

নিরুপায়তায়। এর যে প্রতিকার আছে, প্রতিকার সম্ভব, এ সে জানে না, জানতে চায়ও না। একটি অখণ্ড অভ্যাসের প্রশান্তিতেই বয়ে চলেছে করবী। অভাবের বোধ নেই শোকের চেতনা নেই, নেই বা প্রতিবাদের প্রদীপ্তি। শুধু সমর্পণের স্রোতের টানে ভেসে চলেছে।

'কথা হওয়াটা ভালো।' গম্ভীর মুখে বললে আনন্দ, 'অনেক জিনিস দেখা যায়। তুমি আর কী শিখবে বলো, তুমি মারঘেঁচড়া হয়ে গিয়েছ। কিন্তু আমরা যারা এখনো তেমনি নিরঞ্জন-নির্বিকার হইনি, আমার পক্ষে বাক্য বড় উপকারী।'

'মিছে রাগ কোরো না, ঠাকুরপো। ভাতের উপর রাগ করতে নেই।' করবী কথার মাধুর্যে টানতে লাগল।

'রাগ করা ভালো। রাগ থাকা পুরুষের স্বাস্থ্যের লক্ষণ।' টলল না আনন্দ। 'কিন্তু এ আমার ভাতের উপর রাগ নয়, কারু উপরেই নয়, এ আমার নিজের উপরে রাগ। আমার নিজের অযোগ্যতার নিজের অকর্মণ্যতার উপরে। এ রাগ কাজ করায়, ক্লান্ত হতে দেয় না। এ রাগ জাগিয়ে রাখে। এ রাগ জমার ঘরের জিনিস, খরচের ঘরের নয়। এ ঋণ নয়, এ বিত্ত।'

'বাড়িতে যদি না খাও তো কোথায় খাবে, কখন খাবে?' শেষ চেষ্টায় শেষ টোপ ফেলল করবী। 'না খেয়ে থাকলে ভীষণ কষ্ট হবে তোমার।'

'হবে হোক না। কষ্টই তো সমুদ্রের স্বাদ, জীবনের নুন।' আনন্দ ছোট-ব্যাগটা গুছিয়ে ফেলল। বললে, 'আগে ভাবতাম দুঃখকষ্ট অপমান লাঞ্ছনা জীবনের একটা অসার অনর্থক উপদ্রব। এখন দেখছি এরাই জীবনের বাহক-চালক। কষ্ট না থাকলে এর নিবারণ বা নিরসনের জন্যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়ার মাহাত্ম্য কি? পড়ুক ভাগ্যের এ ইস্পাতের চাবুক আমার পিঠে পড়ুক আমাকে তুলোধুনো

করে ছেড়ে দিক, তবু যেন বলতে পারি কষ্টই আমার প্রাণ, কষ্টই আমার নির্ঝরশক্তি'—চলে গেল আনন্দ।

আনন্দ চলে গেলে ত্রিদিববাবু ফিরলেন। জিগগেস করলেন ডেকে, 'আনন্দ চলে গিয়েছে বউ-মা।'

'চলে গিয়েছে।' করবী কাছে এসে দাঁড়াল।

'খেয়ে গেল?'

'না বাবা, স্নানও করল না।'

'বলে-কয়ে চারটি খাওয়াতে পারলে না বৌমা?'

'কত বললাম। কিছুতেই রাজি হল না।' পরাভূতের মত দাঁড়াল করবী।

'তা যাকগে। পুরুষ মানুষ, একবেলা না খেলে কী হয়? মাঝে মাঝে উপবাস শরীর শুধু শক্ত করে না, চরিত্রও শক্ত করে।' বক্তৃতায় চড়লেন ত্রিদিববাবু 'যদি এখন পরপ্রত্যাশী হবার শখ যায়। পরের আশ গাঙপারে বাস, এ আশা কেউ করে? তুই নিজের ভাত নিজে বসে গরম কর। ওকে যে খাবার জন্যে সাধাসাধি করো নি বৌমা, ভালোই করেছ। উপবাস ওর উপকার ছাড়া অপকার করবে না। কিন্তু আমি বলছিলাম কি—'

করবী কান আরো তীক্ষ্ণ করল।

'বলছিলাম কি, ওকে জলটল খাওয়ার জন্যে একটা টাকা দিয়ে দিলেই পারতে।'

'দিলেও নিত না।'

'টাকার নামে কাঠের পুতুলও হাঁ করে, আর তুমি বলছ কি না নিত না? দিয়ে, দিতে চেয়ে দেখেছিলে নেয় কি না নেয়?'

'খেয়াল হয়নি বাবা!'

'তা হবে কেন? ও যে দেওর, ষাঁড়ের গোবর—'

'ওর কাছে পয়সা আছে।'

'এ তোমার অনুমান। তুমি ওর মনিব্যাগ দেখেছিলে খুলে? সুতরাং যা প্রত্যক্ষ জানোনা তা নিয়ে আন্দাজ করতে এস না। তা টাকা থাক বা না থাক তোমার কর্তব্যটা তুমি করতে।

সুধীন কোর্টে চলে গিয়েছে, আনন্দ এল দেখা করতে। ঢুকতেই সুব্রতাকে পেয়ে প্রণাম করে উঠে বললে, কলকাতা চললাম মা—'

'আজই?' হাতের কাজ ফেলে ঘুরে দাঁড়াল সুব্রতা।

'ছুটি ফুরিয়ে গেল, তারপর টিউশানি আছে—' বলেই আনন্দ ভাবল টিউশানির খবরটা না দিলেও পারত হয়তো। এদিক ওদিক তাকিয়ে ফের বললে, 'সুনন্দ কোথায়?'

'সুনন্দ!' ডাকতে লাগল সুব্রতা। 'তোর আনন্দদা' চলে যাচ্ছে কলকাতা।'

শুধু সুনন্দ নয়, সঙ্গে সঙ্গে নামতে লাগল সুষীমা।

আরতি সিঁড়ির মাঝেই আটকাল সুষীমাকে। বললে, 'শুধু সুনন্দকে তো ডাকছে তুই যাচ্ছিস কেন?'

সুষীমা বললে, 'কলকাতায় যাচ্ছেন, কলকাতায় আমার কত কাজ, একটু বলে দিয়ে আসি'—বলে কাউকে গ্রাহ্য না করে বাইরে বারান্দার দিকে ছুট দিল। 'শুনুন। শুনুন'—

'তোমার মেয়ে কলকাতা চলল না কি?' আরতি সুব্রতাকে লক্ষ্য করল।

'হ্যাঁ, যাবে।' হাতের কাজের মাঝে মন রেখে সুব্রতা বললে।

'যাবে মানে? বলা নেই কওয়া নেই, গেলেই হল?' কামটে উঠল আরতি।

'না, বলা-কওয়া আছে। আজ সকালেই চিঠি এসেছে, ওঁর কোর্টে যাবার আগে'—

'চিঠি এসেছে ? মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার মত অবস্থা হল আরতির।

'হ্যাঁ চিঠি এসেছে, সুষীমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে।' সুব্রতা চোখ না খুলেই যেমন-কে-তেমন বলতে-লাগল। 'ওরা এক রাজ্যের লোক, সকলে মিলে এখানে এসে মেয়ে দেখতে পারবে না। কলকাতায় নিয়ে আসতে হবে। এক ক্ষেপেই সকলে দেখে নেবেন। উনি ছুটির যোগাড় করেই মেয়েকে নিয়ে যাবেন কলকাতা। আমার বোনের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। আমার যাওয়া হয়তো হবে না।'

'সে সব তো পরের কথা গো।' কপালে-তোলা চোখ আর নামাল না আরতি। বললে, 'তোমার মেয়ে যে পাশের বাড়ির ছেলেটার সঙ্গে চলে যাবার জন্যে রওনা হল—'

এতটুকু বিচলিত হল না সুব্রতা। হাসিমুখে বললে, 'আনন্দ কলকাতায় যাচ্ছে শুনে কিছু হয়তো তাকে বলতে গেছে। কলকাতায় আছে কত পুরোনো দিনের বন্ধু—'

আনন্দ বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল। 'শুনুন।' সুষীমার মুখের উপরে ছুঁড়ে মারল।

'চার দিকের দেয়াল কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কথা শোনবার জন্যে।' তারপর সাহস করে আরো একটু কাছে এসে বললে, 'তুমি ঝগড়া করেছ ?'

'ঝগড়া করেছি ? কার সঙ্গে ?'

'বাড়ির সঙ্গে।'

'তুমি কী করে জানলে ?'

'আমি জানি, আমি বুঝতে পারি। এই তো স্নান করোনি, খাওনি কিছু'--

'কলকাতা আর কতটুকু পথ। ওখানে গিয়েই স্নান করব, খাব।'

'আবার আসবে না ?'

'আসব।'

'শোনো। তোমাকে তিন মাস সময় দিয়েছিলাম ? ওটা আরো কম করতে হবে। পারবে না ?'

'তুমি বললেই পারব।'

'মানে, চট করে একটা চাকরি যোগাড় করতে পারবে না ?'

'করতেই হবে। আর শুধু চাকরি নয়, আলাদা ভদ্র একটা বাসা। বিষাদ আমার ছোট ভাইটাকে আমার কাছে এনে রাখব। ওর লেখাপড়া কিছুই হচ্ছে না।'

'খুব ভালো হবে, চমৎকার হবে।' প্রায় হাত-তালি দিয়ে উঠল সুষীমা। দৌড়ে সকলের আগে সে দড়ি ধরেছে সেই আনন্দ তার চোখে-মুখে। 'আর শোনো,' চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল বুঝি, পিছু ডাকল : 'চিঠি লিখো কিন্তু।'

'তুমি আগে লিখো। আমার তো এখন চিঠি নয়, আমার চাকরি।'

'হ্যাঁ, চাকরি। বেশ আমিই লিখব। আর তোমার কাছ থেকে আশা করব কথা তত নয়, যত কাজ। চাঁদের আলো নয়, আলাদিনের আলো।'

চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরল আনন্দ। ডাকল : 'সীমা।'

'ছি ছি, আমি সীমা নই, আমি সু।' চোখ নাচাল সুষীমা। 'সীমার শেষ আছে কিন্তু সু-এর, ভালোর শেষ নেই। আমাকে সু বলে ডেকো।'

'যদি ইংরিজি সু হও ?'

'ইংরিজির মতন করে ডাকবে কেন ? বাঙলার মতন করে ডাকবে।'

'আমরা উচ্চারণে কি অতটা তারতম্য রাখতে পারি ?'

'তা হলে এক কাজ করো। সুসী বলে ডেকো।'

'আবার ইংরিজি?'

'না আদ্ধেক বাঙলা আদ্ধেক ইংরিজি। যেমন আমাদের আধুনিক সংস্কৃতি। বাঙলা সু আর ইংরিজি সী। সী মানে বুঝতে পারলে তো?'

'হ্যাঁ, সে। সেই লোক।'

'মোটেই না। সেই স্ত্রীলোক।'

'হ্যাঁ, সেই মেয়েটি যে আমার সু, যে আমার শ্রী, যে আমার সমস্ত ভালো। সুসী, তোমার জন্মদিন কবে?'

'কেন বলো তো?'

'এমনি।'

'দেরি আছে।'

'বলো না কবে?'

বললে সুষীমা। তারপর আনন্দের দূরভেদী চোখের দিকে তাকিয়েঃ 'তোমার?'

'চলে গেছে।'

'কবে?'

'গতকাল।'

চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরল আনন্দ। বললে, 'তোমার সেই হাতের ব্যথা কেমন আছে?'

দুষ্টুমিতে টলটল করছে চোখ, সুষীমা বললে, 'ভালো আছে।'

'কই দেখি?'

'উরে বাব্বাঃ।' আঁচলে হাত ঢেকে সুষীমা ঘরের মধ্যে ছুট দিল।

'শোনো। দাঁড়াও। যতদিন আমি ফের না আসি, কোথাও চলে যেও না কিন্তু।'

সুষীমা দাঁড়াল না। শুনতে পেল কিনা কে বলবে।

দেখায়, যেটা প্রার্থীর পক্ষে অশোভন। তাই কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল আনন্দ। বললে, 'আমার একটা চাকরির বড় দরকার।' কথাটা খুব সরাসরি হয়ে গেল না? তা হোক, সরাসরিই ভালো। কি জানি, একটু কান্নার সুর না মেশাতে পারলে কোনো প্রার্থনাই বুঝি জোর পায় না। বিশুদ্ধ প্রয়োজন—শুধু এই ঘোষণা অকেজো। তাই ভঙ্গিটা অজানতেই নরম করল আনন্দ, বললে, 'আমাকে দেবেন একটা চাকরি?'

'এই একটা দিয়েছি না?' বাড়ির টিউশানিটাই বুঝি লক্ষ্য করল অবনীশ।

'এটা তো পকেট খরচ। একটা হোলটাইম চাকরি চাই। একটা ভদ্র সুস্থ নির্বিঘ্ন জীবিকা। সামান্য মধ্যবিত্ত গ্রাস যা সম্পূর্ণ ঢাকতে পারে।'

'মানে একটি শাঁসালো কেরানিগিরি।' হাসলেন অবনীশ। 'কিন্তু কেন, এত তাড়া কেন? আপনি তো চীনেবাদাম-চিবুনো ভবঘুরে বেকার নন, আপনি তো আইনের ছাত্র—'

'কিন্তু অতদিন আর অপেক্ষা করা যাচ্ছে না—'

'কেন, হল কী?'

'ছোট ভাইটার টি-বি, ছোট বোনটার বিয়ে, মায়ের ক্যানসার, বাবার রাশীকৃত ধার, মালি-মোকদ্দমা—'

সেই নিত্যিকালের ফিরিস্তি। কাগজে মুখ ঢাকলেন অবনীশ। কণ্ঠস্বর মৃদু করলেন। 'তা আমি কী করতে পারি?'

'আপনাদের এত বড় ফার্ম, আপনি এত বড় কর্তা ব্যক্তি—আপনি ইচ্ছে করলে—'

'চাকরি কি ছেঁদাওয়ালা বাঁশ যে যে কেউ এসে ফুঁ দিলেই বেজে উঠবে?' নড়ে-চড়ে উঠলেন অবনীশ।

'মা আর ছোট ভাইটাকে বাঁচানো যাবে না, তবু ভস্মে ঘি তো ঢালতে হবে। কিন্তু বোনটা এখনো সুস্থ-সমর্থ আছে, ওকে যদি থিতু করতে পারি, দিতে পারি একটা শ্রীমন্ত সংসার, আমার সমস্ত ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ হবে।'

'কিন্তু চাকরি পেতে হলে একটা ভেকেন্সি চাই তো?' অবনীশ বিরক্ত হলেন। 'সম্প্রতি কোনো ভেকেন্সি তো দেখছি না। তবে ভবিষ্যতে—'

'সে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের গর্ভে।' আনন্দ প্রশ্নটাকে স্থির করল। 'অনেক সময় ভেকেন্সি তো ক্রিয়েটেড হয়, তৈরি হয়।'

'তাও জানেন দেখছি। হয়, কৃত্রিম তাপেও ডিম ফোটে। তা দু' রকমে হয়। এক হেড-অফিস থেকে মঞ্জুর হবে কত নম্বর লোক চাই, কোথায় ও কী জাতের, তারপর আমাদের এখানে বাছাই-গোছাই চলবে। তখন এদিক-ওদিক করে হাত সাফাইয়ের কায়দায় কাউকে গুঁজে-গেঁথে দেওয়া যায় হয়তো। তেমন কিছু অর্ডার নেই হেড-অফিসের—' সিগার নিবে গিয়েছিল ধরালেন অবনীশ।

'দু রকম বলছিলেন—আরেক রকম?'

'সে নেপোর কাণ্ড। বাঙলাদেশে সেই নেপোকে চেনেন না, যে-নেপো খালি দই মারে? তেমনি ইংরিজিতেও নেপো আছে—যাকে বলে নেপোটিজম। সেই নেপোর কারবার নেই আমার কাছে।'

'তা ছাড়া আমি তো আপনার ভাগ্নেও নই। আমি এক দুঃস্থ বেকার যুবক—আমাকে আত্মীয় ভাবা কঠিন।'

'হ্যাঁ, এই অবস্থায় শুধু ধৈর্য ধরাই সোজা।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন অবনীশ।

'সোজা? রোগ ধৈর্য মানে না, ঋণ ধৈর্য মানে না, যৌবন ধৈর্য মানে না—'

উত্তর দিলেন না অবনীশ। কাগজে মুখ আড়াল করে রইলেন।

বেশি বচসা করে ঝগড়ার ঝড় তুলে টিউশানির এই টিমটিমে বাত্তিটুকুও নিবিয়ে ফেলবে নাকি? নিরস্ত হল আনন্দ। চলে যাচ্ছে, ঘুরে দাঁড়াল, বললে, 'আপনার অফিসে সুবিধে না হয় অন্য কোনো অফিসে যদি বলে-কয়ে দিতে পারেন—'

'আমি গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাই কেন, কোন্ অফিসে কী অবস্থা তা আমি এখান থেকে কী করে বুঝব,—'

ঠিকই তো। আনন্দ বুঝল সে যা বলবে তাই অযৌক্তিক শোনাবে। প্রার্থনায় বা প্রেমে কি কোনো যুক্তি আছে? সে তাই যথাসাধ্য একটা যুক্তির সুর বার করল। বললে, 'চাকরি না দিন, চাকরি দিতে পারে এমন সব ফার্ম কোম্পানির নাম দিন আমাকে। যেগুলোকে আপনি সম্ভাব্য জায়গা বলে বিবেচনা করেন তেমন একটা লিস্টি। আমি সর্বত্র ঢুঁ মারব, ঘা মারব দুয়ারে। কোথাও না কোথাও খুলে যেতে পারে দরজা।'

'বেশ, এর পর যেদিন আসবেন দিয়ে দেব। হ্যাঁ, খুলে যেতে পারে দরজা।' পৃষ্ঠা ওলটালেন অবনীশ।

খুলে যেতে পারে। আশ্চর্যের দিন ফুরোয়নি এখনো।

অবনীশের দেওয়া ফিরিস্তি অনুসারে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরতে লাগল আনন্দ। অনেক স্লিপ কাটল, ঠেলল অনেক সুইং-ডোর। কখনো কখনো বসলও চেয়ার টেনে। কিন্তু সর্বত্রই এক উত্তর। এক প্রত্যাখ্যান।

কেউ সোজাসুজি অগ্রাহ্য করলে। হবে না, খালি নেই, অন্যত্র দেখুন। কেউ কেউ বা আবার সহানুভূতির পরিবেশ রচনা করে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে শেষকালে বললে, অসম্ভব! কেউ কেউ বা হিসেব দেখাল, ফর্ম দেখাল, নাম লেখাতে পরামর্শ দিল। কেউ কেউ

বললে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। মুরুব্বি ধরুন। অন্তত মুরুব্বির মেয়ে ধরুন।

'একটা চাকরি হয়, স্যার ?' সুইং-ডোর ঠেলে ঘরে ঢুকল আনন্দ।

কলার-টাই-শার্টে ফিটফাট অফিসর বললেন, 'কেন হয় না ? খুব হয়।'

'হয় ? আমি পাই ?'

'কেন পাবেন না ? শ্রমের সম্মান বিশ্বাস করেন ?'

'করি। নিশ্চয়ই করি। এত হাঁটতে পারি খাটতে পারব না ? কী চাকরি ?'

'দরখাস্তে তো দেখছি বি-এ পাশ। পারবেন চাপরাশি হতে ?'

'মাইনে কত ?' প্রথমেই যেন দমবে না আনন্দ।

'তা বি-এ পাশ স্কুলমাস্টারের চেয়ে ভালো। কি, নেবেন ?'

'ছুটো শর্ত যদি পালন করেন—'

'মানে যিনি চাকরি দিচ্ছেন তাঁকেই শর্ত পালন করতে হবে ?' কাঠের পেন্সিলের মাথা দিয়ে নাকের ডগাটা চুলকোলেন অফিসার।

'হ্যাঁ, এক, নাম ধরে ডাকবেন, পিওন-বেয়ারা চাপরাশি বলে ডাকবেন না, আর চাপরাশটা বলবেন না কোমরে আঁটতে—'

'এই আপনার শ্রমের সম্মান !'

'শ্রমের সম্মান তো দিতে পারি কিন্তু এই পোশাকে প্রেমের সম্মান কি দেবে ?' ইঙ্গিতটা প্রাঞ্জল না করেই দোর ঠেলে বেরিয়ে গেল আনন্দ।

সত্যি, অভাবনীয়ের কি আর দেখা মিলবে না ? পথের মাঝে এসে দাঁড়াবেনা বন্ধুর মত ? যদি আশ্চর্য আসতে পারে ভালোবাসার আলো নিয়ে, আবার সে কি আসতে পারেনা স্বাচ্ছন্দ্যের সুগন্ধ ঢেলে ? আলোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে একটু তেল, সুগন্ধকে বাঁচিয়ে রাখবার

জন্যে একটু হাওয়া। অসামান্য প্রেমের জন্যে সামান্য একটু আরামের পরিবেশ। এত দিয়ে শুধু এতটুকু দেবে না? অমৃত রাখবার জন্যে মিলবেনা একটি মৃত্তিকার পাত্র?

পর্যুদস্ত হয়ে হষ্টেলের ঘরে ফিরে এসে আনন্দ দেখল, তার নামে এক চিঠি। ক্ষিপ্র হাতে খুলে ফেলল। পড়ল।

'প্রিয় আনন্দ,

তুমি কী সুন্দর বলো তো! সুন্দর তোমার চোখ, তোমার মুখ, তোমার দৈর্ঘ্য। তোমার গায়ের রঙে যেন একটা নীল আলো মিশে আছে, যা আমার ভীষণ ভালো লাগে—খুব কালো করে যেদিন বৃষ্টি আসে সেদিন বুঝি এমনি দেখা যায় সেই দুর্নিরীক্ষ্য নীল। তোমার মাঝে রয়েছে সেই দুঃসাহসী যে আঘাত পায় কিন্তু হাসি মোছে না মুখের থেকে। কত সহজে পথের মাঝখানে তুমি ঋজু হয়ে দাঁড়ালে, দু বাহু প্রসারিত করে দাঁড়ালে, আর দেখলাম তুমিই আমার প্রথম, তুমিই আমার শেষ পরিপূর্ণতা।

তুমি মনে করো আমি একদিন চলে যাব? কোথায় যাব? কেন যাব? কে আমাকে এত প্রেম অঞ্জলি ভরে দেবে, বুক ভরে দেবে? কেউ না, কেউ না। এ পৃথিবীর এত লোক পাশাপাশি থেকে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে কাজ করে চলেছে, কত তাদের হাসিকান্নার আদান-প্রদান, কিন্তু জনে-জনে শুধিয়ে দেখ কজন পেয়েছে তার আত্মার আত্মীয়, তার রক্তের রক্তিমতমকে? ছেদহীন কাছাকাছি হয়েও মানুষ মানুষকে পায়নি বলেই কারু হৃদয়ে কবিতার কান্না, কারু বা পাথর-পুজো, কারু বা নির্জন অরণ্যবাস।

আমার ইচ্ছে করে তোমাকে এ লোকালয় থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলে যাই, তারপর ঠিকানাহীন অচেনা কোনো জায়গায় নেমে

পড়ে হাঁটি মাইলের পর মাইল, উঁচু নিচু পথ পড়বে আমাদের সামনে, দু পাশে পড়বে বড়-বড় গাছ, অর্জুন আর শাল, পিয়াল আর কৃষ্ণচূড়া, কত পাখি কত তাদের গান, কোথাও পড়বে ঝরনা, কোথাও গুহা, তুমি শ্রান্ত হবে, হবেই, কল্পনায় তোমাকে এই মুহূর্তে শ্রান্তই দেখতে চাই—আমি জল আনব ঝরনা থেকে, তোমার পিপাসা মেটাব, ঠাণ্ডা হাতটা রাখব কপালে, ঘুম পেলে কোল বিছিয়ে দেব, আমি তোমার মুখে রাখব চোখ, আমি আর ঘুমুব না, পারব না ঘুমুতে। হাওযায-হাওয়ায় গাছের শাখা দুলবে, পাতা দুলবে, ছায়া দুলবে, দুলবে পাখির গান, তোমাব চুল উড়বে, আর আমার চারদিক ঘিরে বহুদিন আগে পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া আমারই মত সুখী কত আত্মার আশীর্বাদ ঝরবে। কত শূন্যে মিশে থাকা পরীবা নরম মুহূর্ত রচনা করবার জন্যে নিঃশব্দে গান করবে, স্বপ্নের মধ্যে থেকেও তুমি শুনতে পাবে সে গান। তারপর পশ্চিম মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবে গেলে আকাশে একটি-দুটি করে তারা ফুটলে, সাত স্বর্গের ওপার থেকে আঁধার নামলে, পশুপাখি বন নদী গুহা প্রান্তর ঘুমের আয়োজন করলে তোমাকে ফের ফিরিয়ে দেব তোমার কলকাতায়, তোমার অজস্র কাজের সামনে—

তোমারই সুখী'

বাইরে রোদের দিকে তাকাল আনন্দ। দুটো বেজে গেছে নিচের দোকানে দেখে এসেছে। পাশে রুমমেটকে বললে, 'সুপারইনটেণ্ডেণ্ট এখন নেই, না? যাক, একটা দবখাস্ত রেখে যাচ্ছি পৌঁছে দিস। আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। বাবার অসুখ।'

বাইরে বেরিয়ে এসে রোদের সঙ্গে বুকের অব্যক্ত হাহাকার মিশিয়ে দিয়ে মনে-মনে রক্তে-রক্তে বলতে লাগল, না না, ফিরিয়ে দেওয়া নয়, ফিরিয়ে দেওয়া নয়, ফিরব না আমরা কেউ, ফিরব না

কলকাতায়। আমার আবার কাজ কী। একমাত্র চলাই আমার কাজ। সেই চলাতেই আমি অফুরন্ত।

কী সুন্দর বেহিসেবীর মত চিঠি লিখেছে সুষীমা। এত সুন্দর লেখা সে শিখল কোথায়? ভালোবাসার কাছে শিখেছে। আয়-ব্যয় ভালো-মন্দ সীমা-সংখ্যা কিছুই তাই আর সে গণনা করেনি, সমস্ত দেনা-পাওনা হিসাব-কিতাব তুচ্ছ করে বেরিয়ে পড়বার সে ডাক শুনেছে। ভালোবাসা ছাড়া আর কে সেই দুঃসাহসের ডাক শোনায়? পরিণামের চিন্তাকে উপেক্ষা করার ঔদার্যে নিয়ে আসে। তাই বুঝদার বিচক্ষণ হয়ে ফিরবনা সংকীর্ণের ঘরে, উত্তীর্ণ হব জীবনের মহৎ দুঃখের উৎসবে।

বাস-এ করে মহকুমা শহরে যখন পৌঁছুল তখনো বেলা লেগে আছে। বাজারে-বাজারে ঘুরতে লাগল আনন্দ। আর সেখানে, দেখা হবে তো হ, একেবারে খোদ কালীপদের সঙ্গে।

'কি রে, তুই এলি কখন?'

'খানিকক্ষণ।'

'এখানে ঘুরছিস?'

'কাজ আছে।'

'বাড়ি যাসনি?'

'না।'

'যাবি না?'

'যেতে পারি কিন্তু খাব না।'

ক্রুদ্ধ পা ফেলে বাড়ির দিকে চলে গেল কালীপদ।

আনন্দর পা-ও সেই দিকে, কিন্তু অন্য পথে, নদীর ধার ঘেঁষে, মাঠ পেরিয়ে। যদি ওদিকে ফাঁকায় গেলে সুনন্দকে ধরতে পায়।

ছেলেরা খেলা সাঙ্গ করে হৈ-হৈ করতে করতে চলেছে, সুনন্দকে সহজেই আলাদা করে টেনে নিতে পারল।

'এই যে আনন্দ-দা।' সুনন্দ একেবারে দু-হাত জড়িয়ে ধরল। 'চলুন আমাদের বাড়ি।'

আনন্দ তাকে আবো একটু এক পাশে টেনে নিয়ে জিগগেস করলে, 'তোমার দিদি কী করছে?'

'বা, আমি কী করে বলব। আমি তো এতক্ষণ মাঠে। একবার গিয়ে দেখে আসব?' প্রায ছুটতে চায সুনন্দ।

'শুধু দিদিকে নয়, বাড়ির আর সকলকেও দেখে আসবে কে কোথায় কী অবস্থায়। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?' চোখে-মুখে ভয় ও কৌতুকের চমক ফোটাল আনন্দ। 'তোমার দিদিকে ভয় পাইয়ে দিলে হয় না?'

'কি করে?' ভাবতেও মজা পাচ্ছে আনন্দ।

'নিচে বৈঠকখানার পাশে ছোট অন্ধকার ঘরটায় আমি চুপ করে লুকিয়ে রইলাম, তুমি ভূত দেখাবে বলে দিদিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সেখানে নিযে এলে, অন্ধকারে অনেক ছায়া-টায়া কাঁপল, আর যেই ভয় পেল সুষীমা অমনি জ্বেলে দিলাম আলো—কী মজা।'

'কী মজা। ভীষণ চমকে যাবে দিদি। যাই দেখে আসি।' ছুট দিল সুনন্দ।

এসে দেখল সুষীমা উপরের ঘবে ঘুরে-ঘুরে চুল আঁচড়াচ্ছে।

'দিদি, আনন্দ দা এসেছে।' কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বললে সুনন্দ।

'কোথায়?' খোলা চুলগুলি পর্যন্ত শিউরে উঠল সুষীমার।

'তোমাকে ভয় দেখাবে বলে নিচের ছোট ঘরটায় লুকিয়ে রয়েছে। তুমি যদি যাও আর একটুও ভয় না পাও, ও আনন্দবাবু

যে, বলে যদি স্বাভাবিক ভাবে কথা কও, তা হলে মজা আরো দ্বিগুণ হয়—'

'বাড়ির সবাই কোথায় ?' চার পাশে ত্রস্ত চোখ বুলিয়ে জিগগেস করল সুষীমা।

যখন ভূতের ব্যাপার তখন আপনা থেকেই সুনন্দের স্বর অস্পষ্ট হয়েছে। বললে, ফিরিস্তি দিলে, 'বাবা ক্লাবে, মা রান্নাঘরে তরকারি কুটছে, সুমিতা পাশের ঘরে ড্রয়িং আঁকছে আর পিসিমা আরাধনকে নিয়ে থার্ড অফিসরের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছেন—'

নিশ্চিন্ত হল সুষামা। নিচে নামবার জন্যে এগুলো সিঁড়ির দিকে। বললে 'ভূতের ব্যাপারে তুমি কিন্তু থেকো না। ভূত বেরিয়ে পড়লেই পালিয়ে যেও, ঘরে গিয়ে পড়তে বোসো।'

নামছে দেখে সুনন্দ বাধা দিল দিদিকে, সুষীমাকে। বললে, 'দাঁড়াও, আগে ভূত, পরে ভয়-পাওয়া।'

ছুটে গিয়ে খবর দিল আনন্দকে। চলুন।

অন্ধকার ছোট ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়াল আনন্দ। সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নেমে এল সুষীমা। ঢুকল সেই ছোট ঘরে। আনন্দ কোথায় কোন দিকে দাঁড়িয়ে সহসা ঠাহর করতে পারল না। না পারুক, তবু পিঠের চুল খুলে দিল মুক্ত করে। যেন চুলের রাশ শব্দ করে ভেঙে পড়ল। নির্বন্ধন হবার উচ্ছ্বাসের শব্দ।

হাতের কাছেই সুইচ, টেনে দিল আনন্দ।

সুনন্দের মনে হল উল্টো হয়ে গেল জিনিসটা। খোলা চুলে সুষীমাই যেন ভূত আর আনন্দের চোখেই হক্‌চকিয়ে যাবার ঘোর।

আর, যেদিক থেকেই হোক, ভূত যখন বেরিয়ে পড়েছে তখন আর তার এখানে থাকবার দরকার কি। হাত-পা ধুতে চলে গেল সুনন্দ।

'তোমার ডাক শুনে চলে এসেছি। তোমার চিঠি পড়ে।' বললে আনন্দ।

'বাজে চিঠি।'

'অপূর্ব চিঠি!' আনন্দ হাত বাড়িয়ে রাস্তার দিকের জানলাটা বন্ধ করে দিল। 'চলো এবার তবে আমরা বেরিয়ে যাই দুজনে

'কোথায়?' হাসি-হাসি তরল মুখ সুষীমার।

'তোমার সেই অরণ্যে, গুহায়, ঝর্ণাতলায়—'

'বা, সেইখানে তো থাকিনি, বসবাস করিনি, আবার ফিরে এসেছি, এনেছি ফিরিয়ে।'

'না, না, ফিরব না। ফেরবার জন্যে আমরা বেরুইনি। পেছনের টান ক্ষয় করতে-করতে আমরা চলেছি। আমরা চিরন্তন সামনে, অফুরন্ত সামনে—'

'বা, তুমি এটুকু বুঝলে না—ওটা তো মানসভ্রমণ, কল্পনাবিহার। দেখলে না ফাঁকায়-ফাঁকায় খানিকটা তোমাকে হাওয়া খাইয়ে এনে কাজের সামনে কর্তব্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলাম। আসল কথাটা বলো, চাকরি-বাকরি কদ্দূর?'

'যখন হবে তো হবে—ছক কেটে নক্সা এঁকে হাতে মূলধন নিয়ে ব্যবসা ফাঁদতে ডেকো না—এমনি মহাশূন্যে ঝাঁপ দিতে ডেকো। অরণ্যের ডাক, গহনের ডাক ডেকো—'

'ওসব চিঠিতে লিখো। সিধে গদ্য, চাকরির বাজার কী রকম? আর দেরি কত?'

'আর বেশি দেরি নেই।'

'আমার আর দেরি সইছে না।' যেন ককিয়ে উঠল সুষীমা।

'আমারও না।'

'তাই শিগ্‌গির, খুব শিগ্‌গির-

কত শিগ্‌গির তা কি সুষীমা জানে ? আন্দাজ করতে পারে ?

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুইচটা অফ করে দিল আনন্দ। আর সেই অন্ধকারে সুষীমাকে দুই বাহুর মধ্যে কুড়িয়ে নিল। বললে, আর কিছু নয়—তুমি ভয় পেয়ো না—জ্বালব না আলো, অন্ধকার করে রাখব—যেমন তুমি তোমার চুল খুলে দিয়েছ তেমনি তুমি তোমার আরো সকল বন্ধন আর গ্রন্থি আর আবরণ খুলে দাও একে-একে। তুমি নির্মুক্ত হও, উদ্ঘাটিত হও—তোমাকে আমি দেখি—'

কোন জোরজবরদস্তি ধস্তাধস্তি করল না সুষীমা। ধীরে ধীরে আনন্দের হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে বললে, 'অন্ধকারে কী দেখবে ?'

'সেই অন্ধকারকেই দেখব। দেখব তোমার মাঝে কী সে শক্তি যে আমাকে এমনি করে উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে ? কী সে শক্তি যে আমাকে সর্বস্ব দিয়েও নিঃস্ব না করে ছাড়ছে না ? কী সে নিরন্তর যন্ত্রণা যাতে সে নিজে উজ্জ্বল থেকেও আমাকে দগ্ধ করছে ভস্ম করছে দিনরাত ?'

আবার হাত বাড়াল আনন্দ। যেন দেয়ালে হাত পড়ল। যেন দেয়াল কথা কয়ে উঠল, লক্ষ্মী, সোনা—

কই নাগালের মধ্যে কেউ নেই। যেন মৃদু স্বরে দূর থেকে বলছে অন্ধকার, 'আগে চাকরি, পরে বিয়ে, শেষে—'

তখন আবার দেরির কথা বলছে, ধৈর্যের কথা বলছে। আনন্দ সুইচটা অন করে দিল। আলোয় দেখতে পেল সুষীমা ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। খোলা চুলে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর মত।

মৃদু-মৃদু হাসছে সুষীমা। আরো দূরে সরে যেতে যেতে বলছে, 'চিঠি লিখো কিন্তু।'

নিচে টুং-টাং গিটার বেজে উঠল।

সুব্রতা সরলকে বাইরের ঘরে বসিয়ে উপরে গেল সুষীমাকে খবর

দিতে। গিয়ে দেখল আবাঁধা চুলে ও আঁচলে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে সুষীমা।

'একি, এখনও চুল বাঁধিস নি, ওদিকে সরল এসেছে—'

'এসে লাভ কী!' ঝাঁজিয়ে উঠল সুষীমা। 'এখনো যন্ত্র কেনা হয়নি, বাজনা শিখব কি করে? ওর গিটারটা নিয়ে বারে বারে টানা-টানি হাতাহাতি করে শেখা যায় না। ভারি বিচ্ছিরি—'

'সেই কথাটাই বলে আয় ওকে।'

সংবৃত সংহত হয়ে নামল সুষীমা। মুখে নিষ্প্রাণ হাসি ফুটিয়ে বললে, 'দেখুন এখনো কেনা হয়নি গিটার। কেনা হবে কিনা তাও সন্দেহ!'

'না, না, বাজনা সম্বন্ধে বলতে আসিনি।' মুখ-চোখ ঘোরালো করল সরল: 'একটা ভয়ের কথা বলতে এসেছি। সাবধান করতে এসেছি।'

ভয়ের কথা? সাবধান হবার কথা? দাঁড়াল সুব্রতা। এগিয়ে এল।

'পোস্টমাস্টারের ছেলে আনন্দকে দেখলাম আপনাদের বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করতে।'

'কই, এসেছে আনন্দ?' সুষীমার মুখের দিকে তাকালেন সুব্রতা।

'জানি না তো, দেখিনি তো—' সুন্দর বললে সুষীমা।

'হ্যাঁ, ঘুর-ঘুর করছে। তাকাচ্ছে ইতি-উতি। সন্দিগ্ধ ভঙ্গি, চলাফেরা—' সুষীমাকে লক্ষ্য করল সরল: 'আপনি ওকে কোনো ব্যাপারে শাসন করেন নি তো?'

'শাসন—শাসন আবার কী!' গাছ থেকে পড়বার ভাব করল সুষীমা।

'মানে অশিষ্ট দুর্বিনীত ছেলে তো, অনায়াসে সৌজন্যের সীমা

লঙ্ঘন করে ফেলতে পারে, আর আপনি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়ই তাকে প্রত্যাঘাত করতে পারেন।'

'না না না, সে আবার কী কথা!'

'না হলেই ভালো। তবু আপনাদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া ভালো।' উঠে দাঁড়াল সরল। 'ও কিন্তু সাংঘাতিক ছেলে। প্রতিশোধ নিতে হলেও কিন্তু মাত্রা মেনে চলে না। পাটকেলের বদলে ইট নয়, খাঁটি বোমা ছুঁড়ে মারে।'

'বোমা!' হাঁ করে রইল সুব্রতা।

'বোমার চেয়েও খারাপ, এসিড-বালব। হয়তো সমস্ত শরীর নিটুট রইল মুখটা পুড়ে বীভৎস হয়ে গেল। মৃত্যুর চেয়েও তা নিদারুণ!'

'এই রকম?' সুব্রতা যেন কাঁপতে লাগল হাড়ে-হাড়ে।

'আপনি সুধীনবাবুকে বলুন না পুলিশের কাছে খোঁজ নিতে—ওদের দলের কী সব কর্মকীর্তি, কী সব নৃত্যনাট্য—আর ঐ দলে আনন্দমোহনেরও নাম আছে কি না। ঐ যে হারান মুদির দোকানটা সেদিন লুঠ হল, তার মধ্যে আছে কিনা ঐ আনন্দকান্তির হাত। ওরা প্রথমে আনন্দসুন্দর সেজেই ভাব করতে আসে, তার পর দেখা যায়, কুম্ভের মুখে দুধ কিন্তু অন্তরে বিষ, জ্বলন্ত এসিড। আপনারা আমাদের লাইনের লোক, ডিরেক্ট লাইনের, তাই সাবধান করতে আসা।'

দ্রুত পায়ে উপরে উঠে গেল সুষীমা। সুনন্দকে একান্তে কাছে টেনে নিয়ে আকুল স্বরে বললে, 'খবরদার, কাউকে বলিস নি যেন সেই ভূতের কথা। তোর আনন্দ-দার কথা।'

'ভূত কোথায়!' পেত্নি তো। তোমাকেই তো দেখাচ্ছিল পেত্নির মত।'

'হ্যাঁ, সেই পেত্নির কথা। লক্ষ্মী, সোনা, কাউকে বলিস নি যেন—'

'না, না,' মুখচোখ অসম্ভব গম্ভীর করল সুনন্দ। বললে, 'ভূত-পেত্নির কথা কি কাউকে বলতে আছে?'

ক্লাব থেকে ফিরলে সুব্রতা বললে সুধীনকে। সুধীন পাশের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানল আসেনি আনন্দ।

'যত সব ধোঁয়ার কুণ্ডলী।' উড়িয়ে দিল সুধীন।

অনেক রাতে সজোরে কড়া নড়ে উঠল দরজার। সুষীমার বুক ধড়ফড় করে উঠল। সন্দেহ কি, আনন্দের হাতের শব্দ। কিন্তু বাড়ি ও ভুল করেনি তো? ভুল করেনি তো অত জোরে আওয়াজ করছে কেন? শুধু কানের কাছে মুখ এনে গাঢ় প্রচ্ছন্ন স্বরে সুসী বলে ডাকলেই তো ও উঠে পড়তে পারত।

কেন এত স্পষ্ট হওয়া, স্ফুট হওয়া, স্ফূর্ত হওয়া? এত ত্বরিততড়িৎ আলো কি সুষীমা সহ্য করতে পারে?

কেন পারবে না? সুষীমা উঠে বসল বিছানায়। সে কি লজ্জাবতী লতা? সে কি স্পর্শসঙ্কোচপত্রিকা?

উপর থেকে ত্রিদিববাবু হাঁকলেন: 'কে?'

'আমি আনন্দ।'

উপর থেকে জুতোর শব্দ করতে করতে নামছেন ত্রিদিববাবু আর সমানে তিরস্কার করছেন: 'খেতে আসতে পারে না, এখন কি শুতে আসা হয়েছে? যার ভাত নেই তার ছাদও নেই। বউমা সেই কখন থেকে খাবার নিয়ে ঘরদোর গুছিয়ে বসে আছে আর শ্রীচন্দ্রের দেখা নেই। যে খেতে আসতে পারে না সে শুতে আসে কী সুবাদে? আর, বারে বারে আসবারই কী দরকার? পরোপকার করছেন! বাপ-দাদা যদি পর, তাহলে তাদেরও তো একটু উপকার করা যায়।'

দরজা খুললেন ত্রিদিববাবু। কোথায়, কোথায় আনন্দ ?

এগিয়ে-পেছিয়ে খুঁজে দেখে এলেন ত্রিদিববাবু, আনন্দকে দেখা গেল না।

সুষীমার মনে হল নিশ্চয়ই তাদের বাড়ির কাছে ঘুর-ঘুর করছে আনন্দ। তাকাচ্ছে ইতি-উতি। কিংবা হয়তো রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে আছে চুপচাপ। সে যদি এখন চুপি চুপি বেরিয়ে যেতে পারে রাস্তায়, নিশ্চয়ই আনন্দের দেখা পাবে। নিশ্চয়ই পাবে। তার জন্যেই বসে আছে আনন্দ।

কত সহজ দোর খুলে বেরিয়ে যাওয়া। এমন সুন্দর খিলটা, একটুও শব্দ হয় না খুলতে। কত দিন মধ্যরাতে খিল খুলে নিঃশব্দে নিচে নেমে গিয়েছে সুষীমা। কত দরকারে। মা টের পায়নি, কেউই পায়নি। আলো জ্বালায়নি পর্যন্ত। ভয় করেনি এক বিন্দু। আজই বা ভয় কোথায়, ভয় কিসের! যদি কোথাও ভূত থাকে সে তো অদ্ভুতের মত সুন্দর! ঠিক খিল খুলে আলো না জ্বেলে টিপি-টিপি চলে যেতে পারবে সুষীমা। হয়তো খিড়কির কাছেই অপেক্ষা করছে আনন্দ, যাতে সুষীমাকে না দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে হয় এতটুকু। যাতে সিদ্ধান্তে না এতটুকু সংশয়ের ছোঁয়া লাগে।

সমস্ত গা শিরশির করে উঠল সুষীমার।

তার পর তারা নিশ্চয়ই নৌকো নেবে। এমনিতে এখানে না পাক, ঘাটে পাবে নৌকো। নৌকো করে ভাসবে, ভেসে যাবে। নদীর নাম ইছামতী, ইচ্ছামতী হয়ে উঠবে।

ভাসবে, ভাসবে, ভাসবে, যাবে কোথায় ? নামবে কোথায় ? পৌঁছুবে কোথায় ?

জানি না। চাই না জানতে। চোখ বুজল সুষীমা। অন্ধকার দেখল।

তার পরে—অন্ধকার—জ্যোতির্ময় অন্ধকার। তার পরে অনিমেষে অন্ধকারকে দেখা।

'আর কত ঘুমুবি, ওঠ।' সুব্রতা ডাকতে লাগল সুষীমাকে।

'কী আশ্চর্য, এত ঘুমিয়েছি!' দিনের আলোয় উঠে পড়ল সুষীমা।

ছয়

আরেকটা চিঠি পেল আনন্দ।

আমার দুঃখজয়েব মিতা,

সাতরাজার ধন এক মানিকের খবরজানা শুকপাখির মত ডানা মেলে তোমার চিঠি এল, আমার একাকীত্বে আবার স্মৃতিগন্ধমন্থর কত মুহূর্তের কত প্রতীক্ষার শেষে। তোমার চিঠি এল কত আশ্বাস কত বান্ধবতার সংবাদ নিয়ে। সূর্যাস্তের রঙ-লাগা পশ্চিম আকাশে হংসবলাকারা যে আকুলতায় হৃদয়কে আন্দোলিত করে চলে যায়, সেই আকুলতার সুরজড়ানো তোমার চিঠি আমাকে একটি অঝোর কান্নার দিন উপহার দিয়ে গেল, কান্না-চিকচিক শ্যামল একটি দিন—তোমার সাগর-হৃদয়ে অবগাহনের অমৃত ইচ্ছা ভরা নীল একটি দিন—তোমার মৃত্তিকার দীপে রক্তিম একটি শিখা হয়ে জ্বলবার স্বপ্ন ভরা লাল একটি দিন—দিয়ে গেল তোমার বলিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় দুহাত বাড়ানো স্পর্শলোভ। ভোরের প্রার্থনায় নত হয়ে ঈশ্বরকে কত ডেকেছি, শুধাবার সাধবার জানবার টানবার সেই মানুষকে আজও পাইনি, যাকে তবু খুঁজব, যাকে পাবার আগ্রহে জন্মজন্মান্তরের পথ হেঁটে আসব এই পৃথিবীতে, যুগের পর যুগ, লাখো-লাখো যুগ মগ্ন থাকব

সেই আগ্রহে—এই অপরিসীম আনন্দ থেকে কোনো দিন ছিনিয়ে নিও না আমাকে। তোমাকে ভালোবাসার মধ্যেই তাকে ভালোবেসেছি কিংবা তাকে ভালোবেসেই তোমাকে ভালোবাসলাম।

মধুমন আনন, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তোমাকেও আমি যেতে দেব না কোথাও। জানো, তুমিই সেই প্রথম, যে প্রথমের পদধ্বনিতে অরণ্যে সভ্যতা নামে, আদিম জীবনে নামে প্রেম, কুটিল রাত্রির পারে জাগে প্রমুক্ত সূর্য। তুমিই প্রথম যে আমার কুমারী হৃদয়ে হাত রাখলে—তুমিই আমার অসম্ভবকে সম্ভব করবার ইন্দ্রজাল। কাঠকুড়ুনি মেয়ে কি রাণী হয়নি? রাজার ছেলে কি হয়নি ভিখিরি? পাষাণ কি প্রাণ পায়নি? মরুভূমিতে জাগেনি কি ইন্দ্রপ্রস্থের স্বপ্ন?

তুমি আমাকে ঐশ্বর্যময়ী করলে, কিন্তু তুমি কি জানো আমার আনন্দ রাখবার পাত্র এই বুক কত ছোট। ধরছে না বলেই তো আমার দুঃখ। তোমাকে কি করে জানাই, ওগো আমার মধুযৌবনের ঘুম-ভাঙানিয়া, আমার সব দেবার সব নেবার আশ্চর্য নিটোল সেই ব্যথা? জানো, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি সারাজীবন অনিদ্র থাকতে পারি, তুমি চাইবে, তোমার দুটি হাতে ঢেলে দেব সর্বস্ব। রাশি-রাশি ধূপের মত আমার অন্তর পুড়ছে—আমাকে সুখী হতে ইচ্ছুক দেখলে কি তুমি অসুখী হবে? তোমার মধ্যেই আমার সেই ইচ্ছার পূর্ণতা স্থির হয়ে আছে। তুমিই আমার দিশেহারা সমুদ্রের দ্বীপ। আমার লাবণ্যনদীর নাবিক। আনন, আর কেউ নয়, আর কেউ নয়।

তোমার সুষী।

সর্বেশ্বর মুখুজ্জের নাম কে না জানে। বহু ব্যবসার অধিপতি, ক্রোরপতি সর্বেশ্বর। অনেকে বললে, পারো তো সটান ওর সঙ্গে

গিয়ে দেখা করো, মর্জি হয় তো দেড়শো দুশো টাকার একটা চাকরি খালি সিগারেটের বাক্সের মত অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে রাস্তায়। অনেক বেকার বাঙালি ছেলেকে দিয়েছে অমন চাকরি। দ্রুত সিদ্ধান্তের মানুষ, যদি মেজাজে ঠিক আমেজ লাগে, পস্তাতে হবে না। তবে খুদখাস ইন্টারভিয়ু পাওয়াই কঠিন।

চাকরি তো পাবই না, একটা ইন্টারভিয়ুও পাব না? দেহ পাব না বলে কি মনও পাব না? ক্ষণমন—ক্ষণমনও পাব না?

শুধু মনটুকু, অগ্রটুকু নিয়ে লাভ কী, যদি সমগ্রকে না পাই? শুধু দেখা করায় কী হবে, যদি চাকরিই না পাই?

তবু কে জানে কী হয়, কোনো হিসেবেই লেখা নেই। তুবড়ির খোলে মশলা জমিয়ে রেখে লাভ কী, যদি আগুনের ফুলকিটুকু না লাগে! কে জানে মনের ফুলকিতেই হয়তো দেহের দীপান্বিতা।

অনেক গেল, লিখল, বসল, দাঁড়াল। কাপড়ের আগুন হয়ে থাকল। সর্বেশ্বর মুখুজ্জের থেকে আদায় করল ইন্টারভিয়ু।

আপিসঘরেই ডাক পড়ল আনন্দর।

কারুর মুখের দিকে তাকান না, অন্তত যারা প্রার্থী যারা নিম্নস্থ—আর সংসারে তাঁর চোখে সকলেই প্রার্থী সকলেই নিম্নস্থ—এই সর্বেশ্বরের বিশেষত্ব। এমন নেইআঁকড়া নাছোড়বান্দা যে আনন্দ তার প্রতিও তাঁর কণামাত্র কৌতূহল নেই।

'কী চাই?' টেবিলের উপর কি একটা টাইপকরা কাগজ দেখছেন, তাতেই চোখ নিবদ্ধ রেখে জিগগেস করল সর্বেশ্বর।

অল্প কথার মানুষ শুনেছে, তাই আনন্দও একাক্ষর উত্তর দিল। 'চাকরি।'

'কী চাকরি?'

'যা দেবেন।'

'কদ্দূর পড়েছেন?'

'বি-এ পাশ করেছি।'

'সে তো সকলেই করে।'

'তাই আমিও করেছি।'

'হুঁ! এম-এ পড়েন না কেন? আইন?'

ঢোঁক গিলল আনন্দ। 'সঙ্গতি নেই।'

'যদি সঙ্গতি জুটিয়ে দি, পড়বেন?'

'না।'

'কেন?'

'ভীষণ অভাব।'

'অল্প বয়স, তবু এত অভাব হবে কেন?' তবু চোখ তুলছে না সর্বেশ্বর।

'অভাব বয়স মানে না।'

'বিয়ে করেছেন?'

'না। তবে করতে চাই।'

'সে কি? বেকারের বিয়ে?' তবু সর্বেশ্বরের চোখ নামানো।

'হ্যাঁ, দেখুন, অনেককে অনেক কথা বলেছি, অনেক মিথ্যে কথা বলেছি। আপনাকে পুরোপুরি সত্য কথা বলব।'

'বলুন।' সত্যের দিকেও চোখ ফেলল না সর্বেশ্বর।

'আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি। সেও আমাকে ভালোবাসে। আমরা বিয়ে করতে চাই। বিয়ে করার আগে একটা চাকরি পাওয়া দরকার। তা হলেই সব সহজ হয়। মেয়ের বাপ-মার মত পাওয়া যায়, মেয়েও জোর পায় চলে আসতে। নইলে অভাবের মধ্যে, অনিশ্চয়তার মধ্যে কিছুই যেন ঠিক-ঠিক সুরে বাজতে চায় না।

এমনিতেই তো কত শত্রু, তার উপর যদি গোড়াতেই, শুরুতেই, ভয়াবহ দারিদ্র্য এসে দাঁড়ায় তাহলে সব শেষ, সব মাটি। সব স্বপ্নই ধুলোর সামিল।' কথায় যখন একবারে পেয়ে বসেছে আনন্দকে সে কি আর থামবে? 'দারিদ্র্যেই ব্যাধি, অসন্তোষ, পাপ, ব্যভিচার—কী নয়?'

'বসুন।' এতক্ষণে চোখ চাইল সর্বেশ্বর।

গর্বে স্ফীত হয়ে সামনের চেয়ারে বসল আনন্দ। আরো কী যেন সর্বেশ্বর বলবে তারই আশায় কান পেতে রইল।

'মেয়েটি কেমন দেখতে?'

লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল আনন্দর। তবু জিভ দিয়ে ঠোঁট একটু চেটে বললে, 'সুন্দর! অবশ্য আমার চোখে যে সুন্দর লেগেছে তা বলাই বাহুল্য।'

'আমাকে একবার দেখাতে পারেন?' সর্বেশ্বরের চোখের দৃষ্টি যেন লেগে রইল আঠার মত।

'আপনাকে দেখাবার কী দরকার?'

'না। দরকার আছে। আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন সেই মেয়েটিকে।'

'মানে, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না? তাকে আপনি যাচাই করে নেবেন?'

'হ্যাঁ, তাই বলেন তো তাই।' কি রকম উপর ঠোঁট ফুলিয়ে হাসল সর্বেশ্বর। 'যদি দরকার বুঝি তাকেই চাকরি দেব।'

'তাকেই চাকরি দেবেন মানে?' চেয়ার ছেড়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল আনন্দ।

'মানে আমার যাকে খুশি তাকে চাকরি দেব। এবং যেভাবে খুশি।' চোখ আবার নিচু করল সর্বেশ্বর।

'জানি পাপ আর ব্যভিচার শুধু দারিদ্র্যেরই ভূষণ নয়, বিত্তশালীদেরও বিত্ত। কিন্তু সর্বেশ্বর মুখুজ্জের যে এত নিচু নজর তা কল্পনার দুঃসাধ্য ছিল।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আনন্দ।

কলিং-বেল টিপল সর্বেশ্বর। টিপে রইল। মানে খুব জরুরি ডাক।

কে একজন সেক্রেটারির মত লোক দ্রুত এসে দাঁড়াল সর্বেশ্বরের কাছে। সর্বেশ্বর উত্তেজিত স্বরে বললে, 'দেখুন তো দেখুন তো, কে ঐ লোকটা দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে—চলে গেল এখুনি। দেখুন তো সর্বহারাদের কেউ নাকি?'

বোধ হয় চাকরির কথাই বলবে আশা করে একটু দাঁড়িয়েছিল বুঝি আনন্দ। কিন্তু কথাটা শুনে জ্বলে উঠল নিমেষে। যা হয় তাই হবে—আবার ঢুকল সর্বেশ্বরের কামরায়। বললে, 'আমি সর্বহারা আর আপনি সর্বমারা। হারা-মারা সব সমান। কে জানে ক' দিন পরে হয়তো দাঁড়িপাল্লা উলটে যাবে—আমিই সর্বমারা হব আর আপনি সর্বহারা হয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবেন—' বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল আনন্দ।

কেউ কেউ চাইল বুঝি ওকে ধাওয়া করতে। সর্বেশ্বর নিরস্ত করল। বললে, 'ওর ঠিকানা আছে না?'

'হ্যাঁ, পুলিশে খবর দেওয়াই ভালো।' কে একজন মন্তব্য করল।

'ঠিকানা ঠিক দিয়েছে কিনা তার ঠিক কি।' বললে সর্বেশ্বর।

'চাকরির জন্যে দরখাস্ত যখন তখন ঠিকানা ঠিকই দিয়েছে।'

'মেয়েঘটিত ব্যাপার। এ সব ব্যাপারে ভুল ঠিকানা দেওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়।' যেন চিন্তিত হল সর্বেশ্বর।

হাক্লান্ত হয়ে হস্টেলে ফিরে এসে আনন্দ সুষীমার চিঠি পেলে।

প্রাণের আনন,

আমি তোমার জীবনে মহত্তমা প্রেরণা হয়ে আছি আর তুমি আমার জীবনে মধুমত্তম প্রেম হয়ে থাকো। তুমি কি আমাকে বলবে কোন্ ঈশ্বরের সৃষ্টি আমি তুমি? তিনি কি এমনি ডুবে-যাওয়া ভেসে-যাওয়া বন্যার মত ভালোবাসায় আর কারুর বুকে ভরে দিয়েছেন? যদি না দিয়ে থাকেন তবে কোন পুণ্যে তার অধিকারী হলাম আমরা? যদি দিয়ে থাকেন তবে তারা কারা? আজকে কি তাদের প্রণাম পাবার দিন আসেনি আমাদের কাছ থেকে—যুক্ত দ্বৈত প্রণাম। অঙ্গীকার করো আনন, আমার নিষ্পাপ অকুণ্ঠ ভালোবাসা তুমি নেবে, অন্য কাঁটা রাখবে না, রক্তাক্ত করবে না আমাকে। আর আমাকে দেবে সেই যন্ত্রণা, আতীব্র যন্ত্রণা, আনন্দ যার নাম। আনন, আমি পৃথিবীর সঙ্গে মিশে আছি, নিচু হয়ে আছি প্রার্থনার মত, আর তুমি—তুমি আমাকে ঢেকে রাখ সমাধির গম্বুজের মত।

কে জানে কোথা থেকে এত ভালোবাসা আসে আর কেমন করেই বা আসে। পৃথিবীর প্রতি ঘাসে আমার খুশি জ্বলে, প্রতি ফুলে আমারই সুরভি, আর যত আলো সূর্যে চন্দ্রে তারায় সব আলো আমার চোখের থেকে ঝরছে, আমার বুকের থেকে ঝরছে। এত আলো কে আনল কে ঢালল? কে সে কারিকর যে দূরে থেকেও আমাকে ছুঁয়ে থাকে, আমাকে ভাঙে আর গড়ে, আমাকে জ্বালিয়ে রেখে জাগিয়ে রাখে, দোলায় আর ঘুম পাড়ায়? বদ্ধ গুহার জল ছিলাম, দুর্বার নির্ঝর হয়েছি, ডানামোড়া পাখি ছিলাম আজ বাসা ভাঙা হয়ে উড়ন্ত ছন্দে আলপনা কেটে চলেছি বাতাসে। ছিলাম দূর বনানীর রহস্য, আজ হয়ে উঠেছি হেমন্ত শস্যের গুচ্ছে অঢেল ফসলের ক্ষেত—কী আশ্চর্য শিল্পী! সে বলো তো। যে ভোরের পাখি প্রথম দিনের আলোটি ঠোঁটে করে উড়ে চলে গেল

তোমার কাছে তারই সঙ্গে আমার নিটোল প্রথম ইচ্ছাটি পাঠালাম তোমাকে। ইতি—

সুধী

ভাবল একবার তাকে দেখে আসি। আর মনে যেই একবার সেই ভাবনা এল পিঠে যেন পাখা গজাল।

উড়ে চলল বাসে করে।

কিন্তু কী নিয়ে দাঁড়াবে সে তার সামনে? দাঁড়াবে তার এই ক্লান্তি নিয়ে ব্যর্থতা নিয়ে, নিষ্ঠুর সংসারে সংগ্রামটাই যে পরিহাস তার দৃষ্টান্ত নিয়ে। কোনো সংগ্রামেরই মহত্ত্ব নেই যদি সে শেষ পর্যন্ত না জয়ী হয়। যে ব্যর্থতা ধুলোয় গিয়ে মিশেছে তাকে কে কবে মালা দিয়েছে? জয়ী হয়েছে বলেই মাল্যের মূল্য। কিন্তু তুমি আমার এই সাময়িক সংকীর্ণ রূপ দেখেই আমাকে বিচার কোরো না। আমার মধ্যে রয়েছে আশা, প্রতিজ্ঞা, সহিষ্ণুতা। আর যে ভালোবাসে সে কখনো হারে? তার কি কখনো কম পড়ে?

তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে না পারি, অন্তত দেখব তাকে দূর থেকে। সে ভালো আছে প্রতীক্ষা করে বুক ভরে নিয়ে আসব সেই অতলের তৃপ্তি। তার অন্ধকারের রোমাঞ্চ না পাই, দেখে আসব তার সেই কৃত্রিম আবরণ যা তার অন্ধকারকে অন্ধকার করে রেখেছে।

নিজেদের বাড়ি ফেলে রেখে আনন্দ সুধীনদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল।

সব কেমন ফাঁকা লাগতে লাগল! সুনন্দ-সুমিতা কি ইস্কুল থেকে ফেরেনি? আর যিনি শবরীর মত প্রতীক্ষা করছেন তিনি কোথায়?

দ্বিপ্রহরের নিদ্রার পর সুব্রতা কুয়োতলায় মুখ ধুচ্ছিল, স্পষ্ট হল আনন্দের সামনে।

'একি, তুমি?'

'এসে পড়লাম এ দিকে, তাই। সুষীমা কোথায় ?'

'ওঁর সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছে।'

'সুধীনবাবুর সঙ্গে ? কেন ?'

'পাত্রপক্ষরা মেয়ে দেখবে, একগুষ্টি লোক নাকি, এখানে আসার অসুবিধে, তাই মেয়েকে নিয়েই হাজির করতে হচ্ছে।'

'পাত্র কী করে ?' দিব্যি প্রশ্ন করতে পারছে আনন্দ।

'এম-এ পাশ, স্যামুয়েল-শ'র অফিসর, চার শো টাকা মাইনে—'

'মেয়েকে কোথায় দেখছে ?'

'বরানগরে আমার বোনের বাড়ি। সেইখানেই নাকি ওদের সুবিধে। পাত্র বাগবাজারের দিকে থাকে, বেশির ভাগই আত্মীয় নাকি কাছাকাছি ছড়ানো। বাপই সবাইকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসবেন।'

'বাপ বুঝি বেঁচে ?' কথা একটা বলা উচিত বলেই জিগগেস করল আনন্দ।

'হ্যাঁ, শোনপুরে না কানপুরে মস্ত চাকরি করে। ভালো একখানা বাড়ি আছে বলেও শুনেছি।'

'অনেক লোকে দেখতে এলেই মুশকিল।' বিজ্ঞের মত মুখ করল আনন্দ। 'অনেক কথা হয়, অনেক খুঁত বেরোয়। অনেক সন্ন্যেসীতেই গাজন ভেস্তে যায়।'

'হ্যাঁ, সেই ভয় তো আছেই। তাছাড়া শুনছি ছেলে নিজে দেখবে না।'

'সে আবার কী কথা ?'

'হ্যাঁ, মোটেই আধুনিক শোনাচ্ছে না।' সায় দিল সুব্রতা। 'বলেছে বাবা যদি পছন্দ করেন তা হলে তারও পছন্দ।'

'আর বাবার মত তো নিশ্চয়ই মেজরিটি ভার্ডিক্টের উপর নির্ভর করবে।'

'হ্যাঁ, অনেক ঝামেলা।'

'তারপর কুষ্টি-টুষ্টি মেলানো আছে তো?' সমুদ্রে কুটো ধরতে চাইল আনন্দ।

'হ্যাঁ, না আঁচালে শুধু নয়, মুখ মুছে না মুখশুদ্ধি করলে বিশ্বাস নেই।'

আনন্দ এবার দাবিদাওয়ার কথাটা তুলবে নাকি? দানসামগ্রার কথা?

না, আর নয়। আনন্দ এবার সরাসরি জিগগেস করল: 'বরানগরে আপনার বোনের ঠিকানাটা কী?'

সুব্রতা এমন মুখ-পাতলা, ঠিকানাটা দিয়ে ফেলল।

'আচ্ছা আসি।' বলে চলে গেল আনন্দ।

'বিয়েতে কিন্তু খাটতে হবে।' ক' পা পিছু পিছু গিয়ে মনে করিয়ে দিল সুব্রতা। 'বিয়ে হয়তো কলকাতাতেই হবে। তা তোমার কাছে কলকাতাই বা কি দিল্লিই বা কি। তুমি সুষীমাকে এত ভালোবাসো।'

একবার পিছন ফিরেও তাকাল না আনন্দ।

আরতির দিনের ঘুমটা একটু দেরিতে ভাঙে। আর ঘুম ভাঙবার পর সুব্রতার কাছে যখন শুনল আনন্দ-বৃন্দাবনের কথা তখন তার আর বুঝতে বাকি রইল না সুষীমার কপাল ভেঙেছে।

'তুমি এমন মুখ-আলগা, সব ঘরের কথা ফাঁস করে দিলে।' আরতি খেঁকিয়ে উঠল: 'পাত্রের নামধাম জ্ঞাতগুষ্টি কিছুই বাকি রাখলে না—'

'ওমা, তাতে কী হয়েছে?'

'আহা, তাতে কী হয়েছে! যদি গিয়ে এখন ভাংচি লাগায়!'

'কী যে তুমি বলো তার ঠিক নেই!' স্বামীর মতনই যেন নিরুদ্বেগ সুব্রতা। 'সুষীমাকে কত ও ভালোবাসে।'

'ভালোবাসে!' মুখ বাঁকাল আরতি। 'সেই জন্যেই তো ভয়। সেই জন্যেই তো তার পক্ষে মিথ্যে রটনার সম্ভাবনা। এখন সেই ছেলেকে গিয়ে যদি কিছু লাগায়। যদি বাপকে বেনামী পাঠায়।'

'সত্যি, তা হলে কী হবে!' ভয় পেয়ে আরতিকে আঁকড়ে ধরল সুব্রতা।

'তুমি যে এত বোকা হবে, কোনো মেয়ের মায়ের মুখ যে এত হলহলে হতে পারে, এ বিশ্বাস করতে পারতাম না।'

'তারপরে, জানো ঠাকুরঝি, বরানগরে বোনের বাড়ির ঠিকানাটাও ওকে দিয়েছি।'

'চমৎকার করেছ, ষোলং ষোল দুশো ছাপ্পান্ন কলা পূর্ণ করেছ। ঐ তোমার বোনের বাড়িতেই কেলেঙ্কারি নাটকের শেষ অঙ্ক তবে প্লে হয়ে যাবে।'

হাঁপাতে লাগল সুব্রতা। পরে, অনেক পরে বললে, 'না, আনন্দের মত ছেলে এমন অন্যায় করতে পারে না। ও আমাকে মা বলেছে।'

'তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি। ও তোমার ছেলে হতে চেয়েছে না জামাই হতে চেয়েছে।'

বরানগরের অলিগলি খুঁজে পেতে বার করেছে আনন্দ। একবার কোনো ছুতোয় বাড়ির বাইরে আনতে পারবে না সুষীমাকে? গঙ্গার ধারে কিংবা আর কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবার নাম করে? তারপর একটা ট্যাক্সি নিতে পারবে না? ট্যাক্সি করে কোনো স্টেশনে গিয়ে ধরতে পারবে না ট্রেন? ঝাঁপ দিতে পারবে না আপোষহীন নিরুদ্দেশে?

আর তাকে ঠেকাতে পারবে সুষীমা? তার বাক প্রাণ চিত্ত সবই কি আনন্দের নয়?

অজানা দূরের পথই বা কেন? একটা রাত্রি কলকাতার কোনো

হোটেলের ঘরে তারা কাটাতে পারবে না একসঙ্গে ? গোটা রাত্রি কেন, ক'টা চূড়ারূঢ় মুহূর্ত ! তার গ্রাসের থেকে আর মুক্তি আছে সুষীমার ? এই নিরুদ্ধনির্ঝর আগ্নেয় উচ্ছ্বাস থেকে ?

সূর্যের মুক্ত খড়্গের কাছে কতক্ষণ টিকতে পারবে কুয়াশার কৌশিক ? তার এই অবুঝ অপূরণ কামনার কী করে তৃপ্তি হবে যদি ছিন্ন করতে না পারে সব কৃপণকুণ্ঠার জঞ্জাল। লজ্জার লূতাতন্তু। যদি এক পরম আপ্যায়নী স্থিতিতে সুষীমা না বিপুল স্নেহে প্রসারিত হয়। নইলে কি করে সে সাগর সেঁচে মানিক কুড়োয় !

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সুধীন।

'আরে, তুমি কোত্থেকে ?' উথলে উঠল উল্লাসে।

'এলাম খুঁজে পেতে। যদি কোনো কাজে লাগতে পারি আপনাদের।'

'ওরে ও সুষী, ছাখ এসে আনন্দ এসেছে।'

এইটুকু একটা ছোট বাড়ি, আস্তে বললেই তো হয়। একেবারে গলা ছেড়ে জিগির তোলবার কী হয়েছে ! তা ছাড়া খবরটা কি সম্পূর্ণা-নন্দের ?

ভিতরের দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকল সুষীমা। সঙ্গে সমবয়সী কে একটা প্রতিবেশী মেয়ে।

'একি, তুমি ? এই ভরত্নপুরে ?' সুষীমা অবাক হবার চেষ্টা করল।

জানলা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকাল আনন্দ। এটা সত্যি ত্নপুর না মধ্যরাত্রি হদিস করতে চাইল। সুধীনকে লক্ষ্য করে বললে, 'মেয়ে দেখে গেছে ?'

'এই তো গেল খানিক আগে।'

সুষীমার দিকে আবার তাকাল আনন্দ। তাই চোখে-মুখে কেমন

তাজা-তাজা সাজা-সাজা ভাব। এখন অবিশ্যি মুখ মেঘলা করেছে, চোখের কোণে টুকরো-টাকরা কোপের বিত্যুৎ ঝলসাচ্ছে, কিন্তু এখানে-ওখানে প্রচ্ছন্নে-গভীরে দেখা যাচ্ছে বা বোদের উঁকিঝুঁকি।

'কে-কে এসেছিল দেখতে ?' যেন ইনস্পেকশনে এসেছে এমনি ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল আনন্দ।

'সকলেই এসেছিল। শুধু একজন আসেনি।' সুধীনের কথাটা প্রায় দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল।

'কে আসেনি ? ছেলে ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'কী বাতিক, সে নাকি দেখবে না।'

'তার মানে নিজেকে দেখাবে না। টাক কিংবা ভুঁড়ি আছে হয়তো, নয়তো অন্য কোনো অদ্রষ্টব্য।' নিজেই হেসে ফেলল আনন্দ। সুষীমাও ভবে উঠল হাসিতে।

সুধীন চিন্তিত মুখে বললে, 'কি জানি কি ব্যাপাব—'

'যারা দেখতে এসেছিল তারা কিছু বলে গেছে ? পছন্দ হয়েছে মেয়ে ?'

'এখনো দন্তস্ফুট করেনি কিছু।' বললে সুধীন।

'যাই বলুক না বলুক, ছেলে না দেখে কিন্তু মত দেবেন না। আর,' আনন্দ তাকাল সুষীমার দিকে: 'আর সুষীমাকেও তাকে দেখিয়ে দেবেন।'

চোখে তিরস্কার পুরে তাকাল সুষীমা। কিছুটা বা যেন কৌতুকের ঢেউ। ভাবখানা এই, দেখলে তো, আসল জিনিসেই ফাঁকি। তবে, বুঝতেই পাচ্ছ, এখানে কিছু হচ্ছে না। তার মানে সমূহ বিপদ নেই, তোমার হাতে এখনো কিছু সময় আছে।

না, নেই সময়। উঠে পড়ল আনন্দ। সুষীমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, 'এক গ্লাশ জল খাব।'

'বসুন, সরবৎ নিয়ে আসি।'

'শুধু জলীয় নয় কিছু স্থূল জিনিসও এনো। নিরাহারে আছি অনেকক্ষণ।'

এক প্লেট খাবার ও একগ্লাশ সরবৎ নিয়ে এল সুষীমা।

'হাতটা ধোব।' ঘরের বাইরে পাশের ফাঁকা জমিতে বেরিয়ে এল আনন্দ। মগে করে জল আনল সুষীমা। এক মুহূর্ত নিভৃত হল দুজনে।

'তোমাকে একটু ফাঁকায় পেতে চাই।' বললে আনন্দ।

'কোনো খবর আছে?'

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল আনন্দর। বললে, 'আছে।'

'কী খবর?

'বলব দেখা হলে।'

'গঙ্গার ঘাটে সন্ধের দিকে এস।'

'কোন ঘাট? কখন সন্ধে?' অস্থির হয়ে উঠল আনন্দ।

খাবারে মাছি বসছে, সুধীন হৈ হৈ করে উঠল। হাত ধুতে কতক্ষণ লাগে! হাত থেকে রক্ত ধুচ্ছে নাকি?

সরে গেল সুষীমা। চলে এল আনন্দ।

সন্ধের দিকে আনন্দ চলে এল গঙ্গার পাড়ে। কোন ঘাটটা নির্দিষ্ট হওয়া সম্ভব—বাড়ির কোনটা সন্নিহিত, অনুমান করে নিল। রুদ্ধ নিশ্বাসে লাগল অপেক্ষা করতে। এ-দিক ও-দিক তাকাতে। একটা পাখি উড়ে গেলে তার সঙ্গে উড়ে যেতে।

আসবে কি না তার ঠিক কি।

কে জানে হয়তো বা ফিরে গিয়েছে বিকেলের বাস-এ।

অন্ধকার হয়ে এল দেখতে-দেখতে। সারে-সারে জ্বলে উঠল আলোর মালা। এ-পারে ও-পারে। তবু এখানে-ওখানে ফাঁকায়-ফাঁকায় অনেক অন্ধকার। আলো কি সব কিছুকে ছোঁয়, না, পৌঁছয় সব কিছুতে ?

না, ঐ আসছে সুষীমা। সঙ্গে সেই পাড়ার মেয়েটা।

মেয়েটাকে একটু দূরে রেখে সুষীমা এগিয়ে এল আনন্দের কাছে। জয়ীর মত ভঙ্গি—কী, দেখ, কথা বেখেছি কিনা ?

'ঐ মেয়েটাকে সঙ্গে এনেছ কেন ?' ঝলসে উঠল আনন্দ।

'একটা লেপাফা চাই তো ?' হাসল সুষীমা : 'তা না হলে বাবা বেরুতে দেবেন কেন ?'

'তা হলে এখন যদি আমরা তুজনে একসঙ্গে চলে যাই, ও সাক্ষী হবে তো ?'

'বা, কোথায় যাব আমরা ?' চোখে-মুখে ঝলমল করে উঠল সুষীমা।

'সাক্ষী হলে হবে। এমনিতে কেউ প্রত্যক্ষ না দেখলেও বুঝতে পারবে সকলে, কার সঙ্গে পথ নিয়েছ। সিদ্ধান্ত একটাই হবে। মেয়েটা দেখলেই বা কি, না দেখলেই বা কি।' আনন্দ আরো ঘন হয়ে এল। বললে, 'চলো।'

'কোথায় ?' শুধু চোখে-মুখে নয়, সুষীমার কণ্ঠস্বরেও যেন কে ঢেলে দিল অন্ধকার।

'এই গলিটা থেকে তো বেরুই। যদি একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাই তো ভালোই, নয়তো বাস নেব। এ মোড়ে না পাই ও মোড়ে ঠিক মিলে যাবে ট্যাক্সি।'

'তারপর ?'

'হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরব।'

'কোন ট্রেন ?'

'জানি না। যে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরুচ্ছে প্রথম সেইটে।'

'নামবে কোথায় ?' প্রশ্নটা ঠাট্টার মত শোনাচ্ছে না কিন্তু স্বরটা ভারি ঠাণ্ডা।

'যেখানে তুমি বলবে।'

'বা, আমি বলব কী !' সুষীমা ম্লান হয়ে গেল। 'তুমিই তো আগের থেকে সব ঠিক করবে। জায়গা, বাড়ি-ঘর, টাকা-পয়সা—'

'অত হিসেব নিকেশ সহ্য করতে পারি না। যা হয় হবে।' আগুনের মত শিখা তুলল আনন্দ : 'একবার হাওয়ার মত বেরিয়ে পড়ি পথে। ঝাঁপ দিই রিক্ততার সমুদ্রে।'

সুষীমা বুঝতে পারল কিছু চাকরি-বাকরি এখনো যোগাড় হয়নি আনন্দের। এখনো সে ভাগ্যের নিষেধের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরছে।

একটু বুঝি দৃঢ় করল কণ্ঠস্বর। বললে, 'সমুদ্রে নামলেই ভাবতে হবে তীরের কথা, বন্দরের কথা।'

'না, হবে না ভাবতে। পথই পথ দেখাবে, ঢেউই পাইয়ে দেবে পাড়। তুমি চলো।' সুষীমার হাত ধরল আনন্দ। 'একটা কিছু হবেই। অনেক স্থল-জল অনেক আকাশ, অফুরন্ত ভবিষ্যৎ। কী আছে পরের পৃষ্ঠায় আগে থেকে জেনে নিয়ে জীবনের উপভোগকে পণ্ড কোরো না।'

হাত আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে সুষীমা বললে, 'কিন্তু তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?'

'আমি শুধু ব্যস্ত ? আমি আর্ত, আমি অস্থির। আমি এক বাণবিদ্ধ যন্ত্রণা।'

'কী আশ্চর্য সুন্দর তুমি !' মাথার চুলগুলি উড়ছে, শার্টের খোলা গলাটা বুকের উপর অনেকখানি প্রসারিত, অপলকে খানিকক্ষণ তার

দিকে তাকিয়ে রইল সুষীমা। নিজের থেকেই হাত ধরল এগিয়ে। বললে, 'চলো ওখানটায় বসি। কথা কই।' অন্ধকার মতন একটা ফাঁকা জায়গা নির্দেশ করল। 'এখনো কিছু বানচাল হবার মতন হয়নি।'

যেন অপ্রতিরোধ্য—আনন্দ যেন সমুদ্রকামিনী সাইরেনের ডাক শুনল। সুষীমার সঙ্গে এগিয়ে যেতে-যেতে আনন্দ বললে, 'এখনো ভয়ের কিছু হয়নি বলতে চাও? এখনো না?'

'কোথায় ভয়!' হাওয়ায় সমস্ত মেঘ যেন উড়িয়ে দিল সুষীমা: 'ছেলে যখন দেখছে না তখন নিশ্চয়ই কোথাও গলদ আছে। প্রকাণ্ড রাস্তা আছে বেরিয়ে যাবার।'

'আছে?' ডুবে যেতে যেতে যেন মাটি পেয়েছে এমনি স্বস্তির শব্দ করল আনন্দ।

'নিশ্চয়ই আছে। অন্তত সময় আছে নিশ্চিন্ত। তুমি এর মধ্যে নির্ঘাৎ একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় করে নিতে পারবে।'

ঘাসের উপর অন্ধকারে, বসল দুজনে।

সান্ত্বনার মত নিজের একখানি হাত আনন্দের হাতের মধ্যে ঠেলে দিল সুষীমা। বললে, 'কি পারবে না যোগাড় করতে?'

'পারব।'

'আমি জানি পারবে আর হয়তো বা আজ কাল পরশুর মধ্যে—'

'তুমি কী নিষ্ঠুর! অত শিগ্‌গির যদি না পারি?'

হেসে ফেলল সুষীমা। বললে, 'বেশ, দু মাস। এ খুব ফেয়ার টাইম। তুমি এর মধ্যে দুশো আড়াই শো টাকার একটা টেকসই চাকরি নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে। তারপর ছোট একটা ফ্ল্যাট—আমি আর তুমি, আর আমাদের সংসার। স্বপ্নের প্রাসাদের জন্যেও একটা বাস্তবের ভিত্তি চাই।'

'কিন্তু ভালোবাসা ?' মুঠোর মধ্যে সুষীমার করতল নিংড়ে নিঃশেষ করে ফেলল আনন্দ।

'ভালোবাসা আকাশের মত। কিন্তু তাকে ধরবার জন্যে ছোট একটি বাসা চাই। ধরণীর এক কোণে একটুকু একটু বাসা।'

'দেয়াল চাই ? ছাদ চাই ?'

'চাই না ? একটি সীমা চাই না ? শৃঙ্খলা চাই না ? চাই বলেই তো আমি সুষীমা। সীমায় স্থির, সীমায় সুন্দর।'

'কিন্তু আমি সীমার বাইরে উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ।' হাত ছেড়ে দিয়ে আনন্দ সুষীমার আঁচলটা টেনে ধরল। উত্তেজিত স্বরে বললে, 'চিঠিতে তুমি এত বদান্য অথচ সান্নিধ্যে তুমি কী কঠিন অবিশ্বাস্য কৃপণ! বলতে পারো কোথায় সেই আশ্চর্য শক্তি যে বিনিঃশেষে আমাকে আকর্ষণ করে ? নিষ্করুণ নির্দয় জেনেও যাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না ? কে সে ? সে কি সীমার মধ্যে, স্থৈর্যের মধ্যে, প্রতীক্ষার মধ্যে ?'

এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সুষীমা। অপরাধীর ভীত চোখে, আশ্রয়ের প্রার্থনায়।

সে দৃষ্টি আনন্দও অনুসরণ করল। দেখল সেই প্রতিবেশী মেয়েটা কখন পা টিপে টিপে এগিয়ে এসেছে।

'ও মেয়েটা এখনো আছে কেন ? এখানে ওর কী দরকার! ওটাকে বাড়ি চলে যেতে বলো না—'

'জানো ওর ভারি শখ লাভার দেখে।' নিচু গলায় হেসে উঠল সুষীমা। 'বাড়ির বস্তাবন্দী আইবুড়ো মেয়ে, প্রেম-ট্রেম কোনোদিন আসেনি জীবনে। সকলেরই কি আসে সেই দৈবযোগ ? সকলেই কি পারে গান গাইতে ? সাঁতরে সমুদ্র পার হতে ? তুমি আমার লাভার জেনে তাই ও তোমাকে দেখতে এসেছে।' সমানে হাসতে লাগল সুষীমা : 'পর্দায় দেখে ওর বিশ্বাস নেই। বাস্তবে লাভাররা

কেমন ব্যবহার করে, কেমন লাফঝাঁপ দেয়, তাই দেখতে ওর উদগ্র কৌতূহল। দেখছ না, দৃশ্যটা কেমন দুচোখে গিলছে—'

এ একটা হাসির ব্যাপার, এ একটা দৃশ্য, আনন্দ লাভার, সিনেমার অভিনেতা! হাতে-ধরা সুষীমার আঁচলটা ছেড়ে দিল আনন্দ।

গাঢ়গম্ভীর মুখ করল সুষীমা। বললে, 'সমস্ত সংসার দেখুক। দেখবে, আমি তোমার জন্যেই আছি। কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে না ফুরিয়ে যাচ্ছে না—'

'কে বলে যাচ্ছে না? একটি মুহূর্ত চলে যাচ্ছে মানেই একবিন্দু অমৃত কম পড়ে যাচ্ছে। একটি মুহূর্ত চলে যাচ্ছে মানেই এক পা এগিয়ে আসছে সর্বনাশ।' অস্থিরের মত আর্তনাদ করে উঠল আনন্দ: 'আমি এখন কী করি? কোথায় যাই?'

চলে যাবার উদ্যোগ করল আনন্দ। ঢাল বেয়ে উঠতে চাইল উপরে।

'শোনো।' পিছন থেকে ডাকল সুষীমা।

আশ্চর্য, ফিরল আনন্দ। কেন বিদ্যুৎবেগে সোজা চলে যেতে পারল না? কেন তার ত্রাণ নেই, পলায়ন নেই? পথ পাবে না জেনেও কেন দেয়ালে সে মাথা কোটে? মাটির নিচে নির্জলা পাথর, তবু কেন সে ছাড়তে পাবে না খননের সাধনা?

সন্ধ্যার আকাশে অসম্বৃত অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে আছে সুষীমা।

আবার সেই ডাক। টানবে অথচ হানবে সেই মধুর ভয়ালের সম্ভাষণ। কেন আনন্দ সব ফেলে-ছড়িয়ে তুচ্ছ-ঘৃণ্য করে চলে যেতে পারে না? কেন আবার ফিরে আসে? কিসের এত দড়িদড়া যে গ্রন্থিকে শিথিল করা যায় না? কোথায় যে গ্রন্থি তা যদি সে জানত!

কোথায়! কোথায়!

'শোনো, তুমি অস্থির হয়ো না।' দৃঢ় শান্ত স্বরে বললে সুষীমা, 'আমি তোমার জন্যে জেগে বসে থাকব। আমাকে যদি ফাঁসিকাঠেও লটকায়, আমি জানি কি করে গলার দড়ি আলগা করে খুলে আসতে হয়। কিন্তু তুমি তো তোমার কাজ করবে? একটা চাকরি যোগাড় করে আনবে? আমাকে একটা ঘর দেবে? তুমি নিয়ে এস পক্ষীরাজ ঘোড়া, তাতে করে আমাকে নিয়ে যাও রাজপুরীতে।'

'তাই! তাই!' ছুটে চলে গেল আনন্দ।

কিন্তু কেন, কেন পক্ষীরাজ ঘোড়া? কেন সুষীমা রাজি নয় পদব্রজে? আর যখন রাজি নয় তো আনন্দই বা কেন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না ধুলোয়? কেন সুষীমার কথা সুষীমার শর্তকে সঙ্গত মনে হয়? কে সে শক্তি যে আনন্দকেও সুষীমার যুক্তির প্রতি পক্ষপাতী করে? হ্যাঁ, সুষীমা চাইতেই তো পারে পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাগরের অতল সেচা নিরালা রত্ন। একটি নির্জন নগ্ন পুরী। কী সে জাদু যা তাকে এমন করে ভোলায়? তাকে উদগ্র উদ্‌ভ্রান্ত করে রাখে? ছুটন্ত পক্ষীরাজকে বন্দী করবার প্রেরণা দেয়? অমূল তরুর থেকে আকাশকুসুম ছিনিয়ে আনতে পাঠায়? কী সে রহস্য? কী সে আচ্ছাদিত অন্ধকার?

গলি থেকে বেরিয়ে আসতেই মোড়ের মাথায় আনন্দ দেখতে পেল কতকগুলি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে দেরি হল না এরা কারা। একজনকে তো বেশ কচি ও তন্বী বলে মনে হল। প্রায় সুষীমার মত দেখতে।

থমকে দাঁড়াল আনন্দ। এরাও কি বহন করছে সেই শুদ্ধ-শুক্ল নিরঞ্জনী সত্তা, এদের মধ্যেও কি সেই রহস্যের আকৃতি, আদিম আহুতির অমৃত? এদের মধ্যেও আছে কি সেই আশ্চর্যের প্রতিশ্রুতি? সেই পরমোজ্জ্বলের ঠিকানা?

একজনকে একটু বিরলে ডেকে নিয়ে গেল আনন্দ।

'তোমার নাম কী?' জিগ্‌গেস করল আনন্দ।

'রুমা।'

'সে আবার কী নাম? তোমার নাম সীমা রাখা যায় না? বেশ ছন্দে-সৌষ্ঠবে ধরা সুষীমা নাম?'

'ওমা, তা কী করে হয়? কেউ রমা কেউ রুমা কেউ বড়জোর রুমাঝুমা বলে ডাকে।'

অল্প-শক্তির আলো হলেও, স্পষ্ট দেখতে পেল আনন্দ, মেয়েটা প্রৌঢ়। শুধু বয়সে নয়, পাপে লালসায়। ছদ্মধারণে।

'তুমি যখন সীমা, সুষীমা হতে রাজি নও, তখন তোমাকে আর কে চায়?' বেরিয়ে গেল আনন্দ।

কে তার পথের দিশারি! কে তাকে পথ বলে দেবে? এখন সে কী করে, কোথায় যায়, কে তারো উত্তরের উপশম দেয়? কে দেয় তাকে তার সন্ধানসীমা?

সাত

পাত্রের নাম অজয়শঙ্কর, তাকেই চিঠি লিখতে বসল সুষীমা।

কী অদ্ভুত, একবারটি নিজে দেখতে চাইল না। কণামাত্র কৌতূহল নেই। যেন যদি হয় তো হবে, দেখা শোনার মানে কী। যেন অনেক দিন আগে থেকেই হয়ে আছে দেখাশোনা। এ আর নতুন কী!

ছেলে নিজেই খুঁতে কি না কে জানে। কি রকম বেঁটে বর্তুলাকার হয়তো চেহারা, চোখ দুটো হয়তো কুতকুতে, তার উপর হয়তো পুষ্ট

এক জোড়া গোঁফ আছে। তাই দেখে যাবার মন নেই মানে দেখা দেবারই সাহস নেই।

না, সুধীন দেখে এসেছে। সুশ্রী সুদর্শন চেহারা। বেশ চালাক-চতুর। চালাক-চতুর না হলে কি সাহেবি ফার্মে অফিসর করে। ব্যক্তিত্বের পালিশ আছে বলেই তো উন্নতি করেছে অল্প দিনে।

সুধীনও অনুরোধ করলে, একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে ক্ষতি কি।

'ক্ষতি আছে। যদি বাবা-মার পছন্দ হয় আমি দেখে বাতিল করে দিয়ে আসব, কিংবা যদি ওঁদের পছন্দ না হয় আমি দেখে মঞ্জুর করে নিয়ে আসব কোনোটাই কাজের কথা নয়।' অজয় স্নিগ্ধ সৌজন্যে বললে, 'সুতরাং বাবা-মার মতই বহাল থাকবে, এবং তাই থাকা উচিত।'

'তবু'—মাথা চুলকোলো সুধীন। মানে, শুধু পাত্রেরই তো দেখা নয়, পাত্রীরও একটু দেখা চোখ তুলে। লজ্জার ছবি আঁকতে-আঁকতে হঠাৎ একটু জাগ্রত হওয়া, স্ফুরিত হওয়া।

'দেখা-টেখা অবান্তর।' বললে অজয়। 'যা অবধারিত তাই হবে।'

'তবু'—যেন স্বস্তি পাচ্ছে না সুধীন।

'যখন সমস্তটাই অন্ধকারে ঝাঁপ তখন আর এ চাকচিক্যের প্রয়োজন কী! কে যেন শুনেছিলাম ফাঁসিকাঠে উঠেছে, চোখ বেঁধে দিয়েছে কাপড়ে, দড়ি ধরে টানতে যাবে হাত তুলে বাধা দিয়ে বলেছে, দাঁড়ান, বাঁধতে গিয়ে চশমার ব্রিজটা নাকের উপর থেকে সরে গিয়েছে, ওটা ঠিক করে নিই।' হেসে উঠল অজয়। 'যে ফাঁসি যাবে তার আবার চশমা!'

এখন মা-বাবা বিভক্ত হয়েছেন সিদ্ধান্তে। আত্মীয়জনরাও দু পক্ষ ভাগাভাগি করে নিয়েছে। টানাটানিতে এ-দল ভারী হচ্ছে একবার, ও-দল ভারী হচ্ছে আরেকবার।

মা সবিতার দলের লোকেদের মন উঠছে না মেয়ের গায়ের রঙ ফিট গৌর নয়, বাবা অমরশঙ্করের দলের লোকেদের মত হচ্ছে ঐ মিঠে ফর্সা রঙটিই বাঙালি লাবণ্যের সঙ্গে মিশ খায়, ধবধবে ফর্সাটা কেমন যেন উগ্রতার ঝাঁজ আনে। সবিতার দল বলছে মেয়ের নাকটা শেষের দিকে কেমন একটু চওড়া, অমরশঙ্করের দল বলছে, আলাদা করে নাক কে দেখে, সব মিলিয়ে মুখশ্রীটুকু কেমন নিরবদ্য। তা ছাড়া চিবুকের পাশে ছোট্ট এক ফোঁটা জড়ুল আছে, সবিতার দল বলছে ; অমরের দল বলছে ঐ তো সমরখন্দ আর বোখারা একত্রে। মেয়ে একটু ক্ষীণাঙ্গী না? সবিতার দলের আপত্তি প্রতিপক্ষরা নস্যাৎ করে দিচ্ছে একবাক্যে—আহা, একেই তো বলে তনুমধ্যা, তা ছাড়া মোটা হবার একটু স্কোপ দেবে তো? তা ছাড়া, কী সুন্দর ঘনদীর্ঘ চুল দেখেছ, একেই বুঝি বলে কেশবতী রাজকন্যা, অমরশঙ্করের দল তেতে উঠল ; সবিতার দল বললে, হাঁটু ছাড়িয়ে চুলের ঢল নামাটা সুলক্ষণ নয়, খানিকটা চুল কেটে বাদ না দিলে চলবে না।

দু দলে এমনি দ্বন্দ্ব চলছে—চূড়ান্ত মতামত এখনো এসে পৌঁছয়নি। অজয়ের পক্ষে হাঁ না একটা কিছু বলে নিষ্পত্তি করে দিতে পারত, কিন্তু সে মোক্তার হতে প্রস্তুত নয়।

সুব্রতা বললে, 'একটা কিছু ডিক্রি-ডিসমিস তো করবে।'

'দেখি আবার চিঠি লিখি।' সুধীন বললে।

যেন এমনি করেই দিন যায়। প্রাণপণে প্রার্থনা করছে সুষীমা। যেন এমনি করে দিন যেতে-যেতেই সব স্তব্ধ হয়ে আসে। আর স্তব্ধতার মধ্যেই সম্ভাবনাটা জুড়িয়ে যায়, মিলিয়ে যায় আস্তে আস্তে।

আরতি বললে, 'চিঠি লিখে লাভ নেই, তুমি নিজেই আবার যাও দাদা। নিজে গেলেই তেজ হবে।'

সুধীন নিজেই গেল আর সন্ধ্যার শেষে খবর নিয়ে এল মামলার মীমাংসা হয়েছে।

'তোমার মুখখানা যখন হাসি-হাসি তখন ডিক্রি হয়েছে মামলা।' বললে সুব্রতা।

'হ্যাঁ, রায় বেরিয়েছে, পছন্দ হয়েছে মেয়ে।'

আরতি উলু দিয়ে উঠল।

সুষীমার মনে হল কে যেন তার বুকের পাখিকে লক্ষ্য করে কতগুলি ছররা ছুঁড়ে মারল।

ভাবল এখুনি এত উচ্ছাস করবার কী হয়েছে! এখনো দাবিদাওয়ার প্রশ্ন আছে। একটা ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চয়ই হেঁজিপেঁজি নয়, একটিও আঁচড় না দিয়ে রেহাই দেবে এ হতেই পারে না। আর কে না জানে, সামান্যের জন্যে সমস্ত ভণ্ডুল হয়ে যায়। অকিঞ্চিৎ একটা পেরেক ফুটলেই জাহাজ যেতে পারে রসাতলে।

'দাবিদাওয়ার কথাটা জেনে এলে?" সুব্রতা কৌতূহলী হল।

'দাবিদাওয়া কিচ্ছু নেই।' গায়ের সমস্ত পাথর যেন নেমে গেছে এমনি হালকা শোনাল সুধীনকে।

'কিছু নেই?' এতটাও যেন ভাল শোনাল না।

'না, ছেলের ভীষণ বারণ। তবে সাধ্যমত আমি যা দেব মেয়েকে তাই।'

'কিন্তু দাদা, কুষ্টি মেলানো হয়নি?' জিগগেস করলে আরতি। আর সুষীমার মনে হল এইখানেই রয়েছে ভরাডুবির ঘূর্ণিপাক। আশা করতে লাগল বাবা বলবেন, হ্যাঁ, এইখানেই রয়েছে আসল প্রতিবন্ধ। সমস্ত মীমাংসা হলেও এইখানে, গ্রহ-নক্ষত্রের গরমিলে ঘটে যেতে পারে সর্বনাশ।

আহা, তাই হোক।

সুধীন বললে, ‘দেবেন জ্যোতিষ এমন একখানা কুষ্টি তৈরি করে দিয়েছে যা সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রেই মিলে যাবে। নিশ্চিন্ত হয়ে তাই রেখে এসেছিলাম একখানা। অমরবাবু ফেরত দিলেন। বললেন, ছেলের কুষ্টি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আরো নিশ্চিন্ত করলেন।’

আরতি সুষীমার পক্ষ নিল। বললে, ‘এটা কি ঠিক হবে? সব কেমন অন্ধকার থাকল না?’

সৃষ্টির ঘরবাড়িও অন্ধকার।’ সুধীন বললে, ‘এ বিষয়ে অজয় ঠিকই বলে। বলে, সম্বন্ধটাই যখন অন্ধকারে ঝাঁপ তখন আর জোনাকির চাকচিক্যে প্রয়োজন কী?’

তবে কি বদ্ধ দেযালে কোথাও একটি ঘুলঘুলি নেই?

‘বিয়ের দিন কবে করতে চায়?’

জিগগেস করল সুব্রতা।

‘ওরা তো এখুনি প্রস্তুত। যদি বলি কাল তো কালকেই।’

‘তা কি করে হয়?’

‘আমি এক মাসের সময় চেয়েছি।’ বললে সুধীন।

তবু এক চিলতে ফাঁকা সবুজ মাঠ রেখে দিয়েছে তার কপালে—সুষীমার মনে হল। এই মাঠই কোন না বড় হতে হতে নিয়ে যাবে সমুদ্রের কাছে। ঢেউয়ের কাছে। স্নায়ুতে ধমনীতে হৃৎপিণ্ডে শুধু ঢেউ। রক্তের ঢেউ।

‘ওঁরা কী বলেন?’

‘দিন পনরোর বেশি দিতে চান না। অমরশঙ্কর বেশি দিন থাকতে পারবেন না বলেছেন। অজয়শঙ্কর বলেছে যখন ঠিকই হল তখন আর দেরির কোনো মানে হয় না।’

রুদ্র মেঘ দিগন্তে আবার জমতে লাগল বুঝি।

আরতি বললে, 'যখন দাবিদাওয়া নেই তখন তোমার প্রস্তুত হতে পনরো দিনই যথেষ্ট।'

'আমি তিন সপ্তাহ সময় করে এসেছি।'

যদি এখন এই নিয়ে একটা বচসা হয়। সুষীমার তৃষিত শরীর শুকনো নদীতে নতুন জল আসার আনন্দে কুলকুল করে উঠল।

সারা রাত তার ঘুম এল না। স্বপ্নমগ্ন খোদিত পাথরের মত শয্যায় স্থির হয়ে রইল।

তিন সপ্তাহ! প্রচুর সময়। পর্যাপ্ত সুযোগ। এরই মধ্যে আনন্দ এসে পৌঁছুবে। ঘোড়ায় চড়ে আসবে। তাকে তুলে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। মরুভূমি পেরিয়ে নিয়ে যাবে সোনার রাজধানীতে।

ঠিক করল সকালে উঠেই চিঠি লিখবে অজয়কে। লিখবে, যাকে দেখিনি জানিনি, নাম শুনিনি, তাকে চাইব কি করে? আমার রক্তে আমার সত্তায় তার আকর্ষণ কী! সুতরাং তুমি ফিরে যাও। আমি অন্যত্র বিক্রীত, অন্যত্র ঝংকৃত। আমার দেহ সোনা হোক কিন্তু আমার মন পাথর।

সকালে উঠে সুষীমা কাগজকলম নিয়ে বসল অজয়কে চিঠি লিখতে। ভাবল, তার আগে আনন্দকে একটা চিঠি লিখি।

লিখল : 'আমার আনন্দ,

তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে আছি। হয় আমার জন্যে মদ আনো, নয়তো মৃত্যু আনো। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। আমার সমস্ত দেউল ভেঙে-চুরে আমাকে তুমি ছিনিয়ে নিয়ে যাও, না পারো তো সেই দেউলের দেয়ালে সমাধি দাও নিঃশেষে। তুমি আমার অজস্রসাধের নায়ক, তুমি আমার যৌবনের আবাল্য বন্ধু। শোনাও আমাকে নীলকণ্ঠ সমুদ্রের গান। তুমি আমার রাত্রির অরণ্যের ঘুম ভেঙে দাও। তুমি যদি আমার সূর্য, নাও আমার এই মেঘনিভ শরীর,

তাকে বিদীর্ণ করো, বিগলিত করো। যদি তুমি আমার সোনার হরিণ, আমাকে দাও তোমার মৃগনাভি, তোমার অনন্ত প্রাণের নিমন্ত্রণ।

তোমাকে যদি না পাই, তাহলে আত্মহত্যা করব। আকণ্ঠ মদ যদি না দাও, ঠোঁটে বিষ দিও এক ফোঁটা।

আমি জানি তুমিই আমার সব, তুমি আমার দাতা-ত্রাতা, শ্মশানের শেষ চিতা। তোমাতে ডুবলেই সব দৈন্যের অবসান, সব দারিদ্র্যের নিরসন। মনে আমার যত ইচ্ছার বুদ্‌বুদ ওঠে ওড়ে চলাফেরা করে, সব তোমাকে ঘিরে। মনে মনে যে বিশ্ব আমি পরিক্রমা করি, সে বিশ্ব তুমি-ময়। নিজের গায়ে নিজের হাত পড়লে মাঝে মাঝে চমকে উঠি, এ আমি কা'কে ছুঁলাম। আনন্দ, আমিও তুমি হয়ে গেছি। আয়নায় আমাকে দেখি না, দেখি তোমার ভালোবাসার প্রতিমাকে। সে আমার চেয়ে লাখোগুণে সুন্দর—অতুলনীয় অবর্ণনীয় সুন্দর। সে সুরসুন্দরীকে আমি মনে মনে বন্দনা করি, আর ভাবি কবে তোমার চোখের দর্পণে অর্পণ করব নিজেকে।

আনন্দ, আশা করি তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি চাকরি যোগাড় করতে পারবে। স্টার্টিংএ দেড়শোর মত হলেই চলে যায় আপাতত। তুমি অসাধ্যসাধক, এ একটা পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। পেলেই জয়েন করেই চলে আসবে। নিয়ে যাবে আমাকে। কিছু পয়সার জোর থাকলেই আর কেয়ার করি না। শুধু মেঘে কি মাটি ভেজে? খালি পেটে কি ব্রহ্ম মেলে?

রাত্রির অন্ধকারের পারে এক অনির্বচনীয় প্রভাতের মুখে চোখ মেলে চাইতে দাও আমাকে। ইতি—

তোমার সুষী

আনন্দের চিঠি শেষ করে অজয়ের চিঠি ধরেছে, সুধীন হঠাৎ হৈ-হৈ করে উঠল: 'তোমাদের যে আসল জিনিসই দেখানো হয়নি। কী

আশ্চর্য, কাল অন্য কথায় মেতে ছিলাম বলে এটা একেবারে মনে ছিল না।'

'কী, কী', সুব্রতা আর আরতি দু'জনেই আগ্রহে থরথর করে উঠল।

জামার পকেট থেকে খামে-মোড়া কি একটা জিনিস নিয়ে এসে সুধীন বললে, 'দেখ—দেখ।'

সুব্রতা খাম খুলে ভিতরের জিনিসটা বের করে প্রশ্ন করলে ব্যগ্র হয়ে, 'কে, এ কে?'

'আহা বোঝ না! এই তো পাত্রের ছবি।'

'সত্যি?' ভাবে গলা প্রায় বুজে এল সুব্রতার। 'বা, কী সুন্দর, একেবারে রাজপুত্রের মত দেখতে।'

'ওলো', সুষীমার উদ্দেশে ধ্বনিত হল আরতি: 'দেখবি আয়, রাজার দুলালকে দেখবি আয় চোখ ভরে—'

অনেক চিন্তার পর "শ্রদ্ধাভাজনেষু"টা শুধু লিখেছে, সুষীমা হকচকিয়ে উঠল। চট করে বুঝে নিল কী ব্যাপার, তাই উঠল না জায়গা ছেড়ে। হাতের কলমও অনড় হয়ে রইল।

সুব্রতা বললে, 'তুমি ওর কাছে গিয়ে ওকে লুকিয়ে দেখিয়ে এস। ওর হয়তো লজ্জা করছে।'

'কী গো আমার লজ্জাশীলা! বঙ্গের লবঙ্গলতা!' ফোটোসুদ্ধ খামটা আরতি সুষীমার নাকের নিচে বাগিয়ে ধরল। বললে, 'কী লিখছিস মাথামুণ্ডু, সুন্দর পানে আঁখি মেলে নয়নলোভনকে একবার দ্যাখ!'

টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে লিখছিল সুষীমা, আরতি বারে বারে খামটা নাচাচ্ছে দেখে সুষীমা তার হাত থেকে নিয়ে ঘরের মেঝেতে দূর কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল: 'যে

আমাকে দেখে না তাকে আমিও দেখি না। আমার ফোটোতে যদি তার কৌতূহল নেই আমারও নেই তার ফোটোতে।'

এই নিয়ে আরতি তুমুল বাধাল। সুষীমা আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে বসল। চিঠিটা আর সাঙ্গ করা হল না।

কিন্তু আনন্দ চিঠি পেয়ে আকাশে তোলা বর্শার মত ঝকঝক করে উঠল। দেড়শো টাকায় নেমেছে সুষীমা। আর যদি মদ নিয়ে যেতে না পারি তা হলে যেন বিষ নিয়ে যাই।

কিন্তু তিন সপ্তাহ কেন ?

সন্ধের দিকে আনন্দ বাড়িতে এসে পৌঁছল। এ সময়টায় বাড়ি-ঘর ফাঁকা থাকবে তার এ অনুমান মিথ্যে হয়নি। কিন্তু বউদি এ কার সঙ্গে বসে আলাপ করছে !'

'ওমা ! ঠাকুরপো !' আনন্দে আটখানা হয়ে গেল করবী। 'এস, এস। বাবাঃ, মনে পড়ল এতদিনে। কিন্তু এ তোমার কী চেহারা হয়ে গেছে ! অসুখ করেনি তো !"

কোনো কথা না বলে করবীকে ভিতরের বারান্দায় নিয়ে এল আনন্দ। জিগ্গেস করলে, 'কে ঐ ভদ্রমহিলা !'

'ডাক্তার।'

'ডাক্তার ? লেডি-ডাক্তার ?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল আনন্দ : 'কেন, তোমার কিছু হল নাকি ?'

হেসে উঠল করবী। বললে, 'না, না, আমার কিছু হয়নি, আমার কী হবে ! যাতে কিছু না হয় তার উনি ডাক্তার।'

'তার মানে !'

'মানে বার্থ-কন্ট্রোলের ডাক্তার। এখানে ক্লিনিক খোলা হয়েছে, ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে উপদেশ বিলোচ্ছেন। কিন্তু মেয়েরা কী করবে— পুরুষদের, দস্যুদের গিয়ে ধরো—'

ও প্রসঙ্গের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে করবীকে আরো অন্তরঙ্গে নিয়ে এল আনন্দ। জিগ্গেস করল, 'সুষীমাদের কী খবর?'

'বা, শোননি! সুষীমার যে বিয়ে হচ্ছে।'

'সে তো হচ্ছেই। মেয়েদের জন্মাবার পর থেকেই তো বিয়ে হচ্ছে।' একটুও চঞ্চল না হবার চেষ্টায় স্থির থাকল আনন্দ। বললে, 'কিন্তু কোথায় ঠিক হল সুষীমার?'

'শুনেছি শুধু এক জায়গা থেকে প্রস্তাব এসেছে আর সে জায়গাতেই সম্বন্ধ।'

'পাত্র মেয়ে দেখবে না সেই জায়গা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেইটেই—' আনন্দ বুঝতে পেরেছে দেখে নিশ্চিন্ত হল করবী।

'শেষ পর্যন্ত মেয়েকে দেখলই না পাত্র?'

যেন পাত্র দেখলে সুষীমাকে অপছন্দ করবার সম্ভাবনা ছিল! তা, ছিল না এই বা কে বলতে পারে? সকলের চোখের দৃষ্টি কি সমান? সকলেই কি আর আনন্দের চোখ ধার করে নিয়ে দেখবে? পাত্র তো দেখবে শুধু দৈহিককে, ঐহিককে। দেখবে বণিকবুদ্ধির উপকরণের তৌলে। তার চোখে তো তার ভালোবাসা থাকবে না, সেই নবীন মেঘের নীল অঞ্জন। তার চোখ বাস্তব বিচারের চোখ। নিশ্চয়ই সে চোখে কম পড়ত সুষীমা। অন্তত কম পড়বার সুযোগ আনতে পারত। হয়তো দেখত মাংস কম, রঙ ফিকে, চটক-চমক শূন্য। বিজ্ঞাপন হবার, প্রচ্ছদপট হবার, সভাস্থলে উপস্থিত হবার পক্ষে অনেক কমজোর। কে জানে হয়তো মুখ ফিরিয়ে নিত। কিন্তু এ কি অদ্ভুত অঘটন! তূণে একটি বাণ নেওয়া মানেই ধনুকে সেটা তোলা, অন্ধকারে ছোঁড়া এবং ঠিক লক্ষ্যের মর্মে গিয়ে বিদ্ধ করা। যেন এটা আগে থেকেই লিখিত, স্বীকৃত, স্বাক্ষরিত।

'কই না, দেখেনি বলেই তো শুনেছি।' করবী মুখ বেঁকাল ঃ 'বললে বাড়ির মতেই আমার মত। মেযেটার ভাগ্য ভালো। আপিল হল না মামলার।'

'কিন্তু মেয়ে দেখতে চাইল না পাত্রকে।' আনন্দ ছটফট করে উঠল ঃ 'না দেখে সুষীমা কি করে মত দেয়।'

'মেয়ের আবার মত। জল যে পাত্রে ঢালা হবে সেই পাত্রের রঙ ধরবে। বিবি বানালে বিবি, ঝি বানালে ঝি। ঐ দেখনা আমাকে বোঝাতে এসেছে।' খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়, ডাক্তারনীব দিকে তাকিয়ে বন্ধুব মত হাসল করবী ঃ 'যিনি বোঝবার তিনি যদি বোঝেন তাহলে আমার বুঝতে দেরি কি। তিনি অবুঝ হলে আমিও অসহায়।'

'না, না, অসহায় নন। সেই কথাটাই বলতে চাই বুঝিয়ে।' হাসিমুখে বললে ডাক্তাবনী ঃ 'বোঝা যখন আপনার, তখন আপনাকেই সর্বাগ্রে বুঝতে হবে।'

'শোনো—' ভিতরেব বারান্দায় আরো একটু গভীরেব দিকে গিয়ে আনন্দ ডাকল করবীকে।

'যান। শুনে আসুন। আমি বসছি।' দরজার ওপার থেকে বললে ডাক্তারনী। নাছোড়বান্দার মত বসল গ্যাঁট হয়ে।

করবী কাছে আসতেই আনন্দ বললে, 'তুমি একটা কাজ করতে পারো?'

কি রকম অসম্ভব চোখে তাকিয়ে রইল করবা। ভয়ে-ভয়ে বললে, 'কী কাজ।'

'তুমি একবার পাশের বাড়ি গিয়ে সুষীমার সঙ্গে দেখা করতে পারো?' গলার স্বর হঠাৎ কেমন ধূসর হয়ে এল আনন্দর।

'তা কোন না পারি! কিন্তু কেন বলো তো?' করবী চোখের দৃষ্টিটাকে একটু তীক্ষ্ণ করল।

'ওকে বলবে আমি এসেছি।'

'সে আর কী কঠিন কথা! সে তো তুমি নিজেই সশরীরে হাজির হয়ে বলতে পারো।' করবী হেসে উঠল।

'আমি গেলে আসবে না আমার কাছে।' চোখ নামাল আনন্দ।

'আসবেনা—আসবেনা কেন?'

'আসবেনা মানে আমার সামনে ওকে ওর বাবা-মা আসতে দেবে না।'

এতে এত কী বিস্মিত হবার আছে করবীর! আজ বাদে কাল যার বিয়ে হবে তার সঙ্গে এক অনাত্মীয় সমর্থ যুবককে দেখা করতে দেবে তার অভিভাবক? কেন, দেখা করতে দিলে ক্ষতি কি! অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে নির্দোষ কোনো কথার কাজ থাকতে পারে না?

'বা, আসতে দেবে না কেন!' তুমি তো ওর—ওদের কত চেনা।'

'আসতে দেবেনা মানে নিরিবিলি হতে দেবে না।'

'নিরিবিলি!' অভিধানে নেই এমন যেন একটা নতুন শব্দ শুনল করবী।

'হ্যাঁ, ওকে আমার একটু নিরিবিলি পাওয়া দরকার—একেবারে একলা।'

হঠাৎ কি রকম যেন এক আশ্চর্যের রাজ্যে চলে এসেছে করবী। এরকমটি যেন সে কোথাও শোনেনি, দেখেনি, কল্পনাও করেনি। যেন বুঝেও বুঝছে না ছুঁয়েও ছুঁচ্ছে না—সে কি এক অপরূপের দেশ দেখছে চারিদিকে! কি রকম উজ্জ্বল, অস্থির, আগুন-আগুন দেখাচ্ছে আনন্দকে। যেন একটা তরোয়াল খাপ থেকে বেরিয়ে এসে আর খাপ খুঁজে পাচ্ছে না। সুন্দর নির্লজ্জতায় ঝিলকিয়ে উঠেছে।

'তার আমি কী করতে পারি!' কণ্ঠে তবু সন্দেহ রাখল করবী। 'তুমি এসেছ এ খবর ওকে দিলে—তুমি মনে করো ও চলে আসবে?'

'আসবে। ও আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে আছে। খবর পেলেই ও আসবে।' সন্ধ্যার হাওয়ায় কয়েক গুচ্ছ চুল উড়তে লাগল আনন্দর।

তবু ভয় যায় না করবীর। বললে, 'যদি ওর মা দরজার কাছে দেখে ফেলে, আসতে না দেয়।'

'সেইজন্যেই তো তোমাকে পাঠাচ্ছি। আমার আসার খবরটা কি তুমি সকলের সামনে ভাঙবে নাকি?' এক ফাঁকে ওর কানে-কানে বলবে।' বিশ্বাসী বন্ধুকে যেমন দলে টানে তেমনি ষড়যন্ত্রীর সুরে আনন্দ বললে, 'তারপর কোনো ছুতো করে, ভদ্র নিরীহ ছুতো করে, ওকে নিয়ে আসবে এ-বাড়ি।'

ষড়যন্ত্রের গোপন নেশার সুখ যেন করবীর গায়ে লাগল। সবার স্বর এখন সে ঢের বেশি আচ্ছন্ন করতে পেরেছে। বললে, 'আমাকে ও বিশ্বাস করবে তো?'

'করবে। এমন একটা ভাব দেখাবে যেন তুমি সমস্ত জানো। কী, জানো না?' আনন্দ এক পা কাছে এগুলো।

'জানি।' ভীতু-ভীতু চোখে মৃদু-মৃদু হাসল করবী। 'বুঝে নিয়েছি। কিন্তু ধরো তবু যদি ও বিশ্বাস না করে, আমাকে না সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে!'

'তাহলে এই চিঠিটা তুমি নিয়ে যাও।'

'চিঠি!' যেন এ আবার আরেক কোন অপরূপের টুকরো এমনি শৈশব-চোখে তাকাল করবী। জিগ্‌গেস করল, 'কার চিঠি?' কে লিখেছে?'

'সুষীমার চিঠি। আমাকে লেখা। এই যে—' পকেট থেকে শেষ চিঠিটা বের করল আনন্দ। 'এই যে সম্বোধনে, আমার আনন্দ, আর এই যে ইতিতে, তোমার সুষী।'

হাত বাড়িয়ে তখুনি চিঠিটা ধরতে ইচ্ছে করল করবীর। এমন যেন সে শোনেনি, দেখেনি কখনো। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বললে, 'এতটা এগিয়েছে—তোমার সুষী?'

'হ্যাঁ, এই দেখ না—' চিঠিটা পড়তে শুরু করল আনন্দ: 'আমার আনন্দ, তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে আছি। হয় আমার জন্যে মদ আনো, নয়তো মৃত্যু আনো। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না—'

মদ না মৃত্যু—যেন স্বাদ-না-পাওয়া অপরূপের নেশা এসে লাগল রক্তের গভীরে। করবী ছটফট করে উঠল। বললে, 'লিখেছে, সত্যি লিখেছে?'

'হ্যাঁ, আরো অনেক কিছু লিখেছে। অনেক। তুমি যদি সব চিঠিটা পড়ো তাহলে বুঝতে পারবে।'

'পড়ব, যদি দাও চিঠিটা, সমস্তটাই পড়ব।' শিশু যেন কোন নতুন দেশ দেখতে যাবে তেমনি এক রঙিন উত্তেজনার মধ্যে চলে এল করবী: 'কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। কদিনই বা তোমাদের আলাপ, আর এরই মধ্যে—'

'এক স্তূপ বারুদের সঙ্গে এক কণা আগুনের ক-মুহূর্তের আলাপ?' আনন্দ ছটফট করে উঠল: 'দুই চোখের সঙ্গে দুই চোখের আলাপে দেরি হয়, কিন্তু তৃতীয় নয়নের সঙ্গে তৃতীয় নয়নের সঙ্ঘর্ষ ঘটলে আর দেরি হয় না।'

'কিন্তু ওকে এ-বাড়িতে নিয়ে আসতে পারলে কী হবে?' বাস্তবের মধ্যে তাড়াতাড়ি চলে আসতে চাইল করবী।

'ওকে আর আমাকে, আমাদের দুজনকে, একটা ফাঁকা ঘরে ঢুকিয়ে দেবে। আর তুমি পাহারা দেবে, কেউ কোনো সন্দেহ করতে না পারে, কেউ না দিতে পারে উঁকিঝুঁকি—'

'ফাঁকা ঘরে !' আর আশ্চর্য হবার কী, তবু অভ্যাসবশে প্রথামত আশ্চর্য হল করবী।

'হ্যাঁ, ওর সঙ্গে একটু নিভৃত হব। ছুটো কথা কইব মুখোমুখি। স্পষ্ট, চূড়ান্ত কথা।'

'কিন্তু ফাঁকা ঘরে ওর ভয় করবে না?' করবী নিজের ভয়টাই সুষীমার উপরে আরোপ করতে চাইল।

'না, ভয় কী! এই দেখনা ও কী লিখেছে চিঠিতে!' চিঠিটা পড়তে লাগল আনন্দ। দিনের আলো এত ঝাপসা হয়ে এসেছে যে অক্ষব চিনে পডা সম্ভব নয়, কিন্তু সমস্ত চিঠিটা আগাগোড়া মুখস্ত হয়ে আছে, তাই কোথাও ঠেকতে হল নাঃ 'লিখেছে, 'আমার সমস্ত দেউল ভেঙে-চুরে আমাকে তুমি ছিনিয়ে নিয়ে যাও, না পারো তো সেই দেউলের দেয়ালে সমাধি দাও নিঃশেষে।' বুঝতে পারছ? তারপরঃ 'তুমি আমার অঙ্গপ্রসাধের নায়ক, তুমি আমার যৌবনের আবাল্য বন্ধু। শোনাও আমাকে নীলকণ্ঠ সমুদ্রের গান।' এসব কিছু নয় তেমন, শুধু কথার সন্তোষ। কিন্তু একে তুমি কী বলবে? এই যে—'তুমি আমার রাত্রির অরণ্যের ঘুম ভেঙে দাও। তুমি যদি আমার সূর্য, নাও আমার এই মেঘনিভ শরীর—'

'লিখেছে? এমন সুন্দর করে, খুলে-ঢেলে পারে নাকি কেউ লিখতে? দেখি, দেখি—' চিঠিটা আনন্দর হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিল করবী। বললে, 'না, তাহলে আর তার ভয় কী! সে তো পরিষ্কার। সে তো তৈরি।'

'আর এই সময়টাই প্রশস্ত।' চারদিকে তবু একবার তাকাল আনন্দঃ 'এ সময়টায় নির্দোষভাবে বেরুনো যায় বাড়ি থেকে। ঘর-দোর এখন আলগা, ছোটরা খেলতে গেছে, বড়রা এদিক-সেদিক হাওয়া

খেতে। ঠিক টুক করে বেরিয়ে আসতে পারবে। আর সঙ্গে তুমি যখন আছ তখন লেপাফা তো নিখুঁত।'

'যাই তবে নিয়ে আসি গে।' যেন কোন নির্জন রহস্যপুরীর দ্বার ঠেলবে, খুলে যাবে সাত পাতালের রত্নের মঞ্জুষা, জাগা চোখে এমনি যেন স্বপ্ন দেখল করবী। যা কোনোদিন দেখেনি, যা কোনোদিন শোনেনি তেমনি এক রূপকথার অরূপনগর! কিন্তু শুধুই কি কথা? ঠোঁটের কোণে ছোট্ট একটি হাসির পুঁটলি বাঁধল করবী। বললে, 'শুধু মুখোমুখি দুটো কথা কইবার জন্যেই ও আসবে?'

'হ্যাঁ, আসবে। বলবে, নদীতে নৌকো ঠিক করে রেখেছি।' আনন্দ নদীর দিকে তাকাল: 'ও এলেই, সময় বুঝে, পালাব দুজনে। ট্যাক্সি নেই, বাস নেব না, বাস-এ ধরা পড়ার সম্ভাবনা। নৌকো করে যাব। পাল তুলে দেব।'

পাল-তোলা নৌকো কতদিন দেখেনি করবী।

খিড়কির দরজা খুলে তখুনি প্রায় ছুটছিল, আনন্দ বাধা দিল। বললে, 'শোনো। আরো একটু কথা আছে। আরো একটু কথা না হলে হবে না। তাকে বলবে, চুপিচুপি বলবে, আমার একটা দেড়শো টাকা মাইনের চাকরি হয়েছে—'

'যাঃ।' করবী নিজেই যেন বিশ্বাস করতে চাইল না।

'না, সত্যি হয়েছে।' দ্রুত একটা ঢোঁক গিলে নিল আনন্দ। 'বারান্দাসহ একটা ঘরও ভাড়া নিয়েছি যেখানে গিয়ে সম্প্রতি উঠব দুজনে। আমি বললে হয়তো চট করে বিশ্বাস করবে না। তুমি বললে করবে।'

'আহাহা, এ আবার কী কথা!' করবী এক পা থামল: 'ঘরদোর যা হোক একটা জোটেই, না জোটেতো গাছতলা মারে কে? আর তুমি একটা শিক্ষিত, সমর্থ ছেলে, তুমি তোমার আর ওর, দুটো প্রাণীর

মুখের হাঁ ভরতে পারবে না ? তাছাড়া, তোমার এই একটা বাড়ি নেই, আশ্রয় নেই, আমরা নেই তোমার আপন জন ? যতদিন তোমার কিছু না জোটে ততদিন, সে কটাই বা দিন, ঢেকেঢুকে রাখতে পারব না তোমাদের ? আসল হচ্ছে ভালোবাসা, মন দেওয়া-নেওয়া। আসল হচ্ছে নৌকোয় পাল তুলে দেওয়া নদীতে। এ সব কথা শুধু নভেলেই পড়েছি, কোনোদিন ভাবিওনি দেখতে পাব স্বচক্ষে।' সুষীমার চিঠিটা সযত্নে আঁচলের নিচে জামার গহ্বরে রাখল করবী। 'আসল হচ্ছে ছু' মন একত্র হওয়া। ছু' মন একত্র হলে পাহাড় টলে শুনেছি, সমুদ্র শুকিয়ে যায়, মধ্যরাত্রেই সূয্যি ওঠে।'

যার কখনো মানে জানত না, বানান জানত না সেই অঢেল বিস্ময়ের স্বপ্ন দেখছে করবী।

'হ্যাঁ, এইবার যাও।' যেন মনে করিয়ে দিতে হল আনন্দকে। 'এই ভালো সময়। হয় এখন ও নিরিবিলি চুল বাঁধছে, নয়তো গা-টা ধুয়ে দাঁড়িয়েছে এসে জানলায়—'

খিড়কির দরজাটা পেরিয়েছে, আবার ফিরল করবী। বললে, 'কিন্তু ধরো, যদি ও না আসে ?'

যেন আকস্মিক একটা ঘা খেল আনন্দ, বুকের ঠিক মধ্যিখানে। অভিভূতের মত বললে, 'না, না, আসবে।'

'তবু বলা তো যায় না কখন কী অবস্থা হয় মানুষের—'

'শোননা, আরো ও কী সব লিখেছে !' চিঠির দরকার হল না, মুখস্ত বলতে লাগল আনন্দ : 'আমি জানি তুমিই আমার সব, তোমাতে ডুবলেই আমার সব দৈন্যের অবসান, সব দারিদ্র্যের নিরসন। মনে আমার যত ইচ্ছার বুদ্বুদ ওঠে, ওড়ে, চলাফেরা করে—'

'ওর না-আসা ছু কারণে হতে পারে।' আনন্দর কথার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল করবী : 'এক হতে পারে অভিভাবকরা আটকাবে—

'বা, তার জন্যেই তো তোমাকে পাঠানো। তোমার বন্ধুতা তোমার বদান্যতার কাছে আশ্রয় নেওয়া।' দুই চোখে অস্থির আকূতি নিয়ে তাকাল আনন্দ : 'কী একটা শাড়ি দেখাবে তা ওর পছন্দ কিনা, কিংবা কোনো পুজো-টুজোর প্রসাদ নেবে, বিয়ের আগে নিলে যা মঙ্গল হয়—এমনিধারা লাগসই যা ভালো মনে করো, ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে আসবে—'

'সে ভাঁওতা তো ওর অভিভাবকদের জন্যে। ওকে তো আর ভাঁওতা দেওয়া যাবে না।' করবী আঁচলটা আঁট করে গুটিয়ে নিল।

'না, না, ও সব জানবে, বুঝবে—'

'আর, এইটে, এইখানেই দ্বিতীয় কারণ।' অনির্দেশ্য দূর থেকে কে যেন বাণ ছুঁড়ল : 'যদি ধরো, সব জেনে সব বুঝে বিবেচনা করে নিজের থেকেই ও না আসে! আসতে না চায়!'

বাণটা যেন ঠিক বিদ্ধ করল হৃৎপিণ্ড। বাণ শুধু বাণ নয়, বিষাক্ত বাণ। দিশেহারার মত শূন্য দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে লাগল আনন্দ।

'না, না, তা হয় না—'

'হয় না, ধরো, তবু যদি হয়? যদি নিশ্চেষ্টের মত বিয়ে করাটাই ও শেষ পর্যন্ত নিরাপদ মনে করে?'

'অসম্ভব। তুমি জানোনা ও কী লিখেছে!' অপার্থিব সারল্য ভরা মুখ করল আনন্দ : 'লিখেছে, 'আনন্দ, তুমি আমার সোনার হরিণ। আমাকে দাও তোমার মৃগনাভি, তোমার অনন্ত প্রাণের নিমন্ত্রণ।' আরো আরো কত গভীরের কথা, অগাধের কথা আছে চিঠিতে—তুমি যদি পড়ো তো বুঝবে, সন্দেহও করবে না ও আসবে, ঠিক আসবে—'

'তবু যদি না আসে?'

স্তব্ধ হয়ে রইল আনন্দ।

'তবু যদি না আসে ওর বিয়েটা তুমি ঘটতে দিও না, কিছুতেই না।' চিরদিনের দুর্বল করবী দৃপ্ত ভঙ্গিতে উচ্চারিত হল : 'ওকে তুমি ছেড়ে দিও না, নাকাল কোরো, জব্দ কোরো। ওর সমস্ত দর্প ভেঙে গুঁড়ো করে দিও। যাই, নিয়ে আসি গে।' পা বাড়িয়ে ফের পিছন ফিরে তাকাল : 'বাইরের ঘরে কে এক উৎপাত বসে আছে তাকে তাড়িয়ে দিও।'

'বাইরের ঘরে ?' হঠাৎ খেয়াল হল আনন্দর : 'ও, সেই জন্মনিয়ন্ত্রণের ডাক্তার ? সে এতক্ষণ বসে আছে নাকি ? সময়ের নিয়ন্ত্রণেই সে পালিয়েছে। লোকে বিয়েই করতে পারছে না, অযথা তায় যন্ত্রণা। বার্থকন্ট্রোল কোথায়, এখানে তো ম্যারেজ-কন্ট্রোল।'

করবী ততক্ষণ চলে গেছে পাশের বাড়ি, তাই কথাগুলো নিজের উদ্দেশেই বলল আপন মনে।

কিন্তু বাইরের ঘরে গিয়ে দেখল উৎপাতের অন্যরকম চেহারা। একটা ঠোঙায় করে কতগুলি লজেন্স এনেছে কালীপদ আর তাকে ঘিরে তার ছেলেমেয়েগুলো উল্লাস করছে।

'আপনি কে ?' আগন্তুক মহিলাকে দেখে থমকে গেল কালীপদ। তাকে ঠোঙা-হাতে দেখতে পেয়ে বাইরের খেলা ভুলে তার যে ছেলেমেয়েগুলো ছুটে এসেছিল তারাও।

'আমি ডাক্তার।' মহিলা গম্ভীরমুখে বললে।

'ডাক্তার ? মানে লেডি-ডাক্তার ?'

'যা বলেন—' কালীপদকে ছেড়ে ছেলেমেয়েগুলোকে দেখতে লাগল মহিলা।

'আপনাকে ডেকেছে কে ?'

'কেউ ডাকেনি। আমি নিজের থেকেই এসেছি।'

'ও ! বেড়াতে এসেছেন ? আপনি বুঝি এ পাড়াতে নতুন ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু প্রতিবেশী হিসেবে আসিনি, ডাক্তার হিসেবেই এসেছি।'

'ডাক্তার হিসেবে এসেছেন! কী ভাগ্য! ডাকলেই সব সময় ডাক্তার পাওয়া যায় না, আপনি একেবারে না ডাকতেই চলে এসেছেন! কিন্তু আপনার রুগী কে?'

'তার আগে বলুন, এসব বাচ্চাগুলো আপনার?'

'আর কার?'

'এক দুই তিন—' মহিলা গুনতে শুরু করল।

'ও কি, গুনছেন কেন? কটা নেই- ' সন্তানদের আড়াল করে দাঁড়াল কালীপদ। সবাইকে ভাগ করে দিতে লাগল আর যে যেমন পেল, তাড়া খেয়ে ছুটে গেল এদিক সেদিক।

'এর মধ্যে আবার নেইও আছে নাকি? আশ্চর্য, এত সময় পেলেন কোথায়?'

'সময়?' সলজ্জ হয়ে ঘাড় চুলকোলো কালাপদ: 'তা, সময় একরকম হয়ে যায়।' তারপর চোখ তুলে জিগগেস করলে, 'কিন্তু আপনার রুগী কে তা তো বললেন না—'

'আর কে?' মহিলা প্রায় রুষে উঠল: 'আপনিই রুগী।'

'আমি রুগী? আর আমাকে লেডি-ডাক্তার চিকিৎসা করবে?' আতঙ্কিত হবার ভাব করল কালীপদ: 'আমার তবে কী হল? আমার কি তবে সব বদলে যাচ্ছে? আমি কি মেয়ে হতে চলেছি?'

'বরং পাথর হয়ে যেতে পারলে ভালো ছিল। যাক, আমি উঠি।' উঠে পড়ল মহিলা। 'আপনার স্ত্রী হয়তো ব্যস্ত আছেন। তাঁকে বলবেন আরেক সময় আসব সুবিধে মত।'

কালীপদ ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, 'রুগী হলাম আমি আর দেখা করতে চান আমার স্ত্রীর সঙ্গে—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারলে কি আর এই দশায় উপনীত হন?' সন্তানবাহিনীর

দিকে ইঙ্গিত করল মহিলা। ‘কিন্তু রোগ যদিও আপনার, চিকিৎসাও আবার আপনার স্ত্রী। তাই তাঁকেই আমার বেশি দরকার। আপনি বুঝবেন না, আপনাকে দিয়ে হবে না।’

‘সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে বসে আমার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ব্যাপার আপনি ঘোরালো করে তুলবেন এটা ঠিক নয়। কী ব্যাপার খুলে বলুন। খুলে বললে ব্যাপার বুঝব না, আমাকে দিয়ে হবে না, এমন হতেই পারে না—’

‘না, দরকার নেই।’ ব্যাগটা কাঁধে ঠিকমত গুছিয়ে নিয়ে মহিলা দরজার দিকে এগুলো।

‘দেখুন, রোগকে চান না চিকিৎসাকে চান এ বড় অসুবিধেয় ফেললেন।’ দরজার দিকে কালীপদও দু পা এগুলো : ‘তার উপর আপনি মেয়েছেলে, জোব করে আপনাব পথ আটকাতে পারি না, এও আরেক অসুবিধে। সুতরাং খোলসা করে না বলে গেলে চলে কী করে ?’

‘শুনুন, আমি বার্থ-কনট্রোলের ডাক্তার—’

‘তা আমরা কী করব ? আমরা চিরকাল থার্ডক্লাশের প্যাসেঞ্জার, কোনোদিন বার্থ রিজার্ভ করে যাইনি কোথাও। তা আমাদেব কী বোঝাবেন ?’

‘এ মশাই সে-বার্থ নয়, সিট-বেঞ্চি নয়, এ হচ্ছে বার্থ, জন্ম, জন্মের যন্ত্রণা। এ বার্থ রিজার্ভেশন নয়, এ বার্থ কনট্রোল—’

‘আপনার তো দেখছি এখনো বিয়ে হয়নি—কপাল সিঁথি ধু-ধু করছে। তবে আপনিই বা কী বুঝবেন এই জন্মের যন্ত্রণা ? আর যা নিজে বোঝেন না তাই বা অন্যকে বোঝাবেন কী করে ?’

‘আচ্ছা, আসি, নমস্কার।’

‘হবে-মরবে, প্রকৃতিই সব গোছগাছ করে নেবে। আর কিছুতে

না পারুক, ভূমিকম্প দিয়ে মারবে। ঠেকাও দেখি ভূমিকম্প। ডজন খানেক হলে মরে-ঝরে দুদশটা থাকবে, আর যদি দুটি একটি হয় আর তা যদি দৈববিপাকে টেঁসে যায় তা হলেই তো গেছি। ডেথ কনট্রোল করতে পারেন না, বার্থ কনট্রোল করতে এসেছেন!' মহিলা যদিও নেমে পড়েছেন পথে, কালীপদ চেঁচিয়ে উঠল: 'শুনছেন? নমস্কার।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই দেখল, আনন্দ।

'এ কী, তুই কোত্থেকে?'

কী আশ্চর্য, ঠিক ধরা পড়ে গেল। ঠিক জায়গায় দৈব এসে ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে দিল, হাতের পেয়ালা মুখে ওঠবার আগেই ফেলে দিল মাটিতে। এ সময়ে কালীপদর সন্তানস্নেহ উথলে ওঠবার কী হেতু ছিল, কেনই বা বাড়ি ফিরল অকারণ? ফিরল তো বাইরের ঘর থেকেই আবার চলে গেল না কেন? আড্ডা তো তার এখনো ভাঙেনি। বাড়ি ফেরবার সময় তো এটা নয়। কে ওকে ফেরাল? কোন নিয়তির শাসনে সব চলছে-ফিরছে? হয়তো বাড়ির জানলা থেকে সুষীমা দেখেছে কালীপদর বাড়ি ফেরা। বাড়ি তাহলে আর নিরিবিলি কই? সে আর নিশ্চয়ই সাহস পাবে না আসতে।

যদি সত্যিই বাড়িটা ঝাপসা-ঝাপসা ফাঁকা-ফাঁকা হত, আর টিপি-টিপি পায়ে উসখুস আঁচলে যদি সত্যিই আসত সুষীমা, আসত তার বুকভরা তপ্ত রিক্ততার সামনে, তা হলে—তাহলে কী? হৃৎপিণ্ড তাণ্ডব শব্দ করতে লাগল। তাহলে যদি নদীতে নৌকোয় পাল তুলে নিরুদ্দেশে চলে যেতে সে রাজি নাও হয়, তবু তাকে আনন্দ কিছুতেই ফিরে যেতে দেবে না। তার নিস্পৃহতাকে তার নির্মলতাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে। ছেঁড়া পালের নৌকো ডুবে যাক, নদী শুকিয়ে যাক হারিয়ে যাক বালিস্তূপে! দেখা দেবে আরেক নদী। পাল তুলবে আরেক নৌকো। মাতবে আরেক তুফান।

কী করবে সুষীমা ? বাধা দেবে নিশ্চয়ই, চিৎকার করবে। বেশ তো, ছেড়ে দিচ্ছি, পারো তো যাও না বেরিয়ে। ছুটে দরজা খুলতে গিয়ে দেখবে বাইরে থেকে শেকল তোলা। হ্যাঁ, বৌদিই সাহায্য করেছে। তোমাকে যাতে পাই সে সাধনে সে আমার ষড়যন্ত্রী। আস্ত যদি না পাই যেন অন্তত ভেঙে দিয়েও পাই। যেন আর নিটুট পালাতে না পারো, খোঁড়া পায়ে চলতে গিয়ে পড়ো মুখ থুবড়ে। তখন কোথায় যাবে আমাকে ছাড়া ? তখন আমি ছাড়া কে আর ধুলো থেকে তুলবে তোমাকে হাতে ধরে ? আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে ? তোমাকে অনাঘ্রাত পাই বা দলিত-মর্দিত করে পাই, তুমিই আমার প্রসাদা সৌরভ। ছিন্ন করলেও তুমি, অচ্ছিন্ন রাখলেও তুমি।

না, যেন সহজে না রাজি হয় সুষীমা। ছলনায় যদি সে আসেও সে যেন অবাধে না বশ মানে। বাঘের মুখে সে যেন মৃত্যুর-নেশায়-বুঁদ ঝিমুনো গরু হয়ে না থাকে। যেন সে প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ করে। যতই দুর্দান্ত হয়ে উঠুক আনন্দ, সুষীমা যেন সে রূপেও বিমুগ্ধ না নয়, যেন সে প্রশান্ত না থেকে প্রখরনখর হয়ে ওঠে। মোটমাট যেন একটা লড়াই শুরু হয়, আর্তনাদে দেয়াল-দরজা বিদীর্ণ করে। মোটমাট যেন তারা ধরা পড়ে। একজন ধরা পড়লেই আরো একজন বাঁধা পড়বে সঙ্গে সঙ্গে। মন্দ কি, যদি আনন্দকে নিয়ে যায় থানায়। ভালোবাসার জন্যে সব তার সইবে। লজ্জা সইবে, অপমান সইবে, সইবে রাজদণ্ড। অন্তত লোকজানাজানি তো হবে। বিয়েটা তো বন্ধ হবে। চাকরি যোগাড় করবার মেয়াদটা তো আরো লম্বা করা যাবে।

কিছু একটা করবার জন্যে সমস্ত অণুতে-রেণুতে চঞ্চল হয়ে উঠল আনন্দ। যদি সে রামায়ণের কোনো বীর হত, কত সহজে ছোট্ট

একটি পেলব পাখির মত সুষীমাকে বুকে তুলে নিয়ে আকাশপথে চলে যেতে পারত আর এক রাজ্যে, যেখানে রহস্যের পর উন্মোচন আর উন্মোচনের পর রহস্য চলেছে অপূর্বের সঙ্গে অতৃপ্যের মিছিল। যেখানে নিত্যকাল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অপূর্ণতার মুখচন্দ্রিকা। যেখানে অপূর্ণ বলেই আকাঙ্ক্ষা সুন্দর আর আকাঙ্ক্ষা বলেই তা অপূর্ণতায় সুস্বাদু।

কিসের কী কনট্রোল, সংযম-নিয়ম, হিসেব-নিকেশ, দড়ি-দড়া, বাঁধন-ছাঁদন, সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে উড়ে যাক মহাশূন্যে। কিছু একটা হোক, কিছু একটা সে করুক তাই হওয়াবার জন্যে।

ছেলেগুলো লজেন্স নিয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছে, কালীপদ খুঁজতে লাগল করবীকে। বড়মেয়েকে জিগগেস করল, 'তোর মা কোথায় ?'

'জানি না।'

আনন্দের দিকে তাকাল কালীপদ। আনন্দের মুখেও সেই অস্পষ্ট উদ্বেগ। 'কই দেখছি না তো, আমিও তো খুঁজছি।'

তা হলে এই অবস্থায় কালীপদ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় কী করে !

উন্মনা হয়ে আনন্দকেও অপেক্ষা করতে হয়।

না, বেশি দেরি করে নি, ফিরে আসছে করবী। কিন্তু একলা আসছে। অতলস্পর্শ আরাম পেল আনন্দ। সুষীমাকে যে বাইরে প্রথম পা ফেলতেই কুৎসিত একটা ঝড়ের মুখে পড়তে হয়নি এ এক আশ্চর্য শান্তি।

'কোথায় গেছলে ?' কালীপদ হুমকে উঠল।

নিষ্প্রভ হতে হতে হাসির পলতেটি উস্কে দিল করবী। বললে, 'পাশের বাড়ি গিয়েছিলুম। মেয়ের বিয়ে, মাসিমা ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

'কিন্তু ঘর সংসার ছেড়ে কতক্ষণ পরের বাড়ি থাকা যায়। আর এদিকে দেখছ, আনন্দ এসেছে। বদান্যতায় উদ্বেল হল কালীপদ: 'ওকে কিছু খেতে দাও।'

'সে আর তোমাকে বলতে হবে না।' আনন্দর দিকে চেয়ে করবী হাসল মুখ টিপে।

'ঘরে এখন আর কী আছে ওকে খেতে দেবার মত?' কালীপদ চিন্তিত স্বরে বললে।

'না, ঘরে কিছু দেখছি না তো। বাইরে থেকেই আনতে হবে।' ঠোঁটর কোণে আবার হাসির পুঁটুলি ফোটাল করবী। 'তা কাছাকাছিই আছে।'

'না, না, কাছাকাছি দোকানটা ভালো নয়। আমি দূর থেকে, বাজার থেকে নিয়ে আসছি।'

আনন্দ বাধা দেবার আগেই করবী খলবল করে উঠল, 'তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। কী ও খাবে না খাবে আমি ব্যবস্থা করে দেব। অন্য কোথায় যাচ্ছিলে মনে হচ্ছে, সেইখানেই যাও নিশ্চিন্ত হয়ে।'

আশ্চয, বাধ্য ছেলের মত বাইরের দিকে পা বাড়াল কালীপদ।

এক পা গিয়েই ফের ফিরে এল। বললে, 'ও সব ডাক্তার-ফাক্তার কে আসে তোমার কাছে? খবরদার, ওদেরকে ঘেঁষতে দিও না।'

'তুমি থাকতে সাধ্য কি কেউ ঘেঁষে?'

'নিজে বিয়ে করেনি, এসেছে পরের বিয়েতে হস্তক্ষেপ করতে।'

'আবার এলে আমি তাই বলব। বিয়ে করে আগে দৃষ্টান্ত দেখাও পরে এস মাস্টারি করতে। লোকে বিয়ে করতে পারছে না, মেয়ে নিয়ে বাবা-মা হিমসিম খাচ্ছে, ওরা এসেছে মজা দেখতে। ঘোড়াই নেই তো চাবুকের ধুম।'

কালীপদ চলে গেলে আনন্দ জিগগেস করল করবীকে : 'এলো না?'

'আসবে।'

আসবে? সমস্ত বিশ্বসংসার যেন আনন্দর চোখের সামনে দুলে উঠল। বিশ্বসংসার কোথায়, আকাশ-পৃথিবী কোথায়, এ যে সুষীমার সেই লাবণ্যে ধোয়া অথচ বিষাদে মোছা মুখখানি, প্রার্থনাভরা অথচ ভয়-ভয়-করা চোখ দুটি!

'আসবে, কখন আসবে?'

'এখন নয়।' নিজেরও অজানতে গলার স্বর ঝাপসা করল করবী।

'এখন নয়? তবে কখন?'

'মধ্যরাত্রে।'

কত বাকি এখনো মধ্যরাত্রির? বালিকা গোধূলির নিরীহ মুখের দিকে সস্নেহে তাকাল আনন্দ। বললে, 'কী কথা হল?'

'বাড়ি ভর্তি লোক, সহসা ফাঁকায় কি পাই ওকে একটু?' করবী বললে, 'অনেক কসরৎ করে তবে নিয়ে আসতে পারলুম বারান্দায়।'

'এল?'

'চোখের ইশারায় যে ডেকেছিলুম কাছে আসতে। ঐটুকু ইশারায়ই বোধহয় ও বুঝল আমি ওর আপন জন, কোনো গোপন কথা নিয়ে এসেছি। একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। এমনিতে আমার কাছাকাছি হয়নি কোনোদিন, আমাকে গিন্নিবান্নিদের দলেই ফেলে রেখেছে। কিন্তু মানুষের চোখ কত গভীর কথাই না বলতে পারে নিমেষে। আমার একটি চাউনিতেই ও পড়ে নিল আত্মীয়তার ইতিহাস। বললে, কী, কী হয়েছে? চোখে মুখে কী সে প্রবল ঔৎসুক্য!' করবীও যেন কুমারী হয়ে গিয়েছে এমনি ভরাট আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

'তুমি কী বললে?'

'চট করে আমি গলাটা ঝাপসা করে ফেললাম। বললাম, আনন্দ এসেছে।' চোখেমুখে ঝলসে উঠল করবী : 'গলার স্বরে ওর বিশ্বাস আরো গাঢ় হল। ওর আর সন্দেহ রইল না যে আমি ওর হৃদয়ের প্রতিবেশী।'

'আমার নাম শুনে ও ভয় পেলনা ?' ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করল আনন্দ।

'চমকে উঠল। জিগগেস করল, কোথায় ? এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। হ্যাঁ, তাতে একটু ভয় মাখানো ছিল বৈকি। কিন্তু তা তোমাকে ভয় নয়, আনন্দকে ভয়। এত আনন্দ কী করে ধরবে ও ওর জীবনে—সেই ভয়।'

'ও হয়তো ভেবেছিল ওদের বাড়িতেই বুঝি চলে এসেছি।'

'আমি বললাম, ও বাড়িতে আছে। একা ঘরে একলাটি আছে চুপ করে। তোমাকে যেতে বলেছে।'

'বললে ? তুমি বললে ? পারলে বলতে ?' বিদেশের ভাষা স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছে করবী এইটেই যেন আনন্দের বড় বিস্ময়।

'হ্যাঁ, কেন পারব না ? বললাম, বাড়িঘর এখন একদম ফাঁকা, একটা মশামাছিরও ভয় নেই। তা ছাড়া আমি আছি, আমি ফাঁকা করে দেব, তোমরা নির্বিঘ্নে মিলতে পারবে। যা তোমাদের বলবার-বোঝবার সব নিষ্পত্তি করে নেবে নিভৃতে। আমি রক্ষী থাকব।'

'ও কী বলল ?'

'বলল, ঘরে নয়, পথে মিলব।'

কথাটা বুঝি অদ্ভুত ভালো লাগল আনন্দর। প্রায় মন্ত্রের মত আওড়াল কথাটা : 'ঘরে নয় পথে মিলব।'

'আমি বললাম, পথ থেকে সেই যদি ফের ঘরেই উঠবে, তবে ঘর থেকে পথে নামতেই বা দোষ কী। ঘর থেকে পথ আর পথ থেকে

ঘর—একই কথা। কখনো কখনো পথও ঘর, ঘরও প্রান্তর—হাঁড়িকুঁড়ির করবী রং-তুলির কবি হয়ে উঠল।

'পথে নামবে বললে, বেশ তো, কবে, কখন?'

'আমিও তাই বললাম। বললাম, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই তো ও এসেছে। ঘাটে নৌকো ঠিক করা আছে। ছপ্পর তোলা নৌকো। নৌকোতে ছইয়ের নিচে দুজনে বসবে গুটিসুটি হয়ে—কী মজা, কেউ দেখতে পাবেনা জানতে পাবেনা। ভাসতে-ভাসতে কতদূর চলে যাবে না জানি। পথ আর ঘর একসঙ্গে। ঘর হচ্ছে নৌকো, পথ হচ্ছে নদী।'

'ও বুঝি তাতে রাজি নয়?'

'না, না, রাজি।' করবী আরো অস্ফুট করল কণ্ঠস্বর। 'ও বললে, চারদিকে লোকজন— এখন বেরুলে ধরা পড়ে যাব। ওকে মধ্যরাত্রে আসতে বোলো।'

'তার মানে ও আসবেনা? আমি যাব?' আনন্দ অস্থির হয়ে উঠল।

'বা, তুমিই তো যাবে। তুমি গেলেই তো ও আসবে।'

'আমি যাব কোথায়?'

'তুমি অন্ধকারে দাঁড়াবে গিয়ে ঐ গাছতলায়। রাত বারোটা-একটা হলে, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, ও নেমে আসবে চুপিচুপি। তারপর তোমার সঙ্গে মিলবে, তোমার কাছে ধরা দেবে। সেই কী না জানি লিখেছে, তুমি আমার সূর্য, নাও আমার এই মেঘনিভ শরীর—'

'মিথ্যে কথা।'

'কী মিথ্যে কথা? ও লেখেনি? ঐ চিঠি এখনো আছে আমার বুকের মধ্যে। ওকে বলেওছি আমি—'

'কী বলেছ?'

'বলেছি, তোমার চিঠি আমি দেখেছি। কিন্তু তোমার শরীর তো মেঘনিভ নয়, তুমি তো ঠিক কালো নও—তুমি তুষারনিভ। কথা শুনে ও হাসল। বললে, সূর্যে তুষার তো গলে যাবে কিন্তু মেঘের ভয় নেই, মেঘই বরং ঢেকে রাখবে সূর্যকে। এত কথা হল আর তুমি বলছ মিথ্যে কথা ?'

'মিথ্যে কথা মানে ও আসবে না, ও নামবে না, ও ঘুমিয়ে পড়বে।'

'ককখনো না।' প্রবল কণ্ঠে বললে করবী। 'ও আমাকে কথা দিয়েছে। ও ঠিক আসবে। এতটুকু ভুল করবে না।'

'আমার যে চাকরি হয়েছে এ কথা বলেছ ওকে ?'

'ধ্যেৎ। এ-সবের মধ্যে চাকরি-বাকরির কথা কী! মেঘ সূর্য নদী মধ্যরাত্রি এ-সবের মধ্যে কার মনে থাকে ডাল-ভাতের হিসেব, বাজার দরের ওঠা-পড়া ? যদি বসে-বসে হিসেবের যোগ-বিয়োগই করতে হয় তা হলে জোয়ার চলে যায়, ঘাটের নৌকো আর খোলা হয়না।' সব জানে সব বোঝে এমন আলো-মাখা মুখ করল করবী : 'ও সব বলতে গেলে নিশ্চয়ই ও ক্ষুণ্ণ হত, ওর ঘুষ-ঘুষ মনে হত—যেন তুমি আমার সঙ্গে বেরিয়ে চলো আমি তোমাকে তার জন্যে মূল্য দিচ্ছি—যেন সেই ভালো কাপড়-চোপড় গয়না-গাটির লোভ দেখিয়ে ফুসলিয়ে বার করে নিয়ে আসা—ছি, ভালোবাসার কাছে ও সব ধুলোরাশি ছাইপাঁশ কে নিয়ে যায়! ভালোবাসা ভালোবাসা—কী না জানি বলে—দূর দিগন্তের ডাক। যমুনাপুলিনের বাঁশি। বাঁশি শুনবে আর সঙ্গে সঙ্গে মনিব্যাগে টাকা গুনবে এ রাধিকার দশা নয়—' করবী হেসে উঠল।

'তবু একবার বললে পারতে।'

'অত অল্প সময়ের মধ্যে কাজের কথা সারব না বাজে কথায় সময় নষ্ট করব। তারপর দেখলাম ওর মা আসছে আমাদের দিকে, কেটে

পড়তে হল। ও সব ভাবনা মনেই এল না। তারপর দেখলাম যা ওর চেহারা!'

'কার চেহারা?'

'তোমার সুষীমার। একটা বাঁশি-শোনা চেহারা! যে বাঁশি কুল ভাঙে বেড়া ভাঙে ঘর ভাঙে বুক ভাঙে সেই বাঁশির শব্দ। উত্তেজনায় কাঁপছে, পায়ের আঙুলের ডগায় দাঁড়িয়ে আছে। এখুনি যেন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে, যেন এমন এক বর্তমানে, যার কোনোদিন কোনো ভবিষ্যৎ নেই।' কোথাকার ঘুমভাঙা বাঁশির স্বর যেন করবীও শুনতে পেয়েছে, সেও বুঝি ঝাঁপ দেবে সমুদ্রে। 'ও সব কথা বলবার আর দরকারই হল না—'

'তবু যদি গোড়াতেই বলতে, জানো সীমা, ঠাকুরপোর চাকরি হয়েছে, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে, তা হলেই বোধহয় ভালো হত. ও সাহস পেত—'

'তা তুমি যা পাওনি তা ওকে মিছিমিছি বলি কী করে?

'পাইনি মানে?'

'চাকরি তো আর সত্যি পাওনি।' দুষ্টু-দুষ্টু হাসল করবী। 'চাকরি পেলে খবরটা আরো সমারোহে আসত আর সর্বপ্রথমে তোমার বাবা-দাদাদের কাছে, সুষীমার কাছে নয়। ওটা তোমার ছলনা।'

যেন ধরা পড়ে গেল আনন্দ। শুকনো মুখে ঢোঁক গিলে বললে, 'তা হলই বা না ছলনা। চাকরি পাওয়া কথা নয়, ওকে পাওয়া নিয়েই কথা। আর প্রাপ্তিই সব, পদ্ধতি কিছু নয়। তুমি যদি বলতে তা হলে ও ঠিক বিশ্বাস করত।'

'না, না, তুমি মিথ্যার প্রশ্রয় নেবে কেন?' বললে করবী, 'তুমি যে ভালোবাসো। তুমি সত্যের উপর দাঁড়িয়ে। সত্যের জন্যে যত

কঠিনই হোক সর্বোচ্চ দাম তুমি দেবে। সে হোক দুঃখ, হোক আঘাত, হোক নিষ্ঠুরতা, তুমি পেছপা হবেনা। নইলে ভাবো—'

করবীর প্রদীপ্ত মুখের দিকে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল আনন্দ।

'নইলে ভাবো যখন ও দেখবে তোমার চাকরি পাওয়ার খবরটা মিথ্যে তখন ও তোমাকে কী মনে করবে? মনে করবে ভণ্ড, ধোঁকাবাজ। তোমার ভালোবাসাকেও অবিশ্বাস করবে। আমাকে অগ্রাহ্য করুক তাতে দুঃখ নেই কিন্তু আমার ভালোবাসা যেন অবিশ্বাস্য না হয়, এই তো পুরুষের কথা, বীরের কথা। তোমার এই সত্যই ওকে সাহস দেবে। তা ছাড়া সুষীমা, এমনিতেই যা দেখলাম, সাহসের শিখা হয়ে জ্বলছে। ও তো তোমাকে ভালোবাসে।'

'ভালোবাসে?'

'সে এক দিব্য রূপ ওর চোখে মুখে। শরীরের সমস্ত তন্তুতে ও বাজছে যন্ত্রণার মত। আজ মধ্যরাত্রে শোনাবে তোমাকে বাজনা, আনন্দের বাজনা। কী আশ্চর্য, কত কথাই যে আমি বলছি, পাগলের মত—আমি ও সবের কী জানি। তোমাকে এখন খেতে দিই—চা করি।'

করবীকে আনন্দ অনুসরণ করল রান্নাঘরে।

করবী বললে, 'আমি আজ রাত্রে ঘুমুব না।'

'ঘুমুবেনা?'

'না, আমি মধ্যরাত্রি দেখব।'

'সে কি, তুমি তো তখন ঘরে বন্দী।'

'কিন্তু মনে তো বন্দী নই। মনে মনে দেখব সেই মধ্যরাত্রি।'

'তোমার ঘর থেকে তো কিছুই দেখা যাবে না। না নদীর ঘাট না বা রাস্তা না বা ওদের খিড়কির দরজা—'

'তাই তো বলছি মনে-মনে দেখব। জেগে বসে থাকলে বা বাইরে বেরুলে তো সন্দেহ জাগানো হবে।' স্বপ্ন দেখছে এমনি বিভোর মুখে

করবী বললে, 'আমি চুপচাপ পড়ে থাকব বিছানায়। চোখ বোজা থাকলে কী হবে, ঘুমুবনা। কান পেতে থাকব কখন ট্রেজারিতে বারোটার ঘণ্টা পড়ে। শুনব, দেখব অনুভব করব, তুমি দাঁড়িয়ে আছ অন্ধকারে, সুষীমা টুক করে খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে, তোমরা হেঁটে যাচ্ছ নদীর দিকে, কেউ কাউকে কোনো কথা বলছ না, এত দূরে-দূরে যাচ্ছ যেন পরস্পরকে চেননা পর্যন্ত—গোপনে-গভীরে কী নিঃশব্দ পরিচয়—তারপর উঠছ গিয়ে নৌকোয়, নদী ছলছল করে উঠেছে, নৌকো উঠেছে দুলে—কোথায় চলেছে দুজনে কেউ জানে না, রাতের চাঁদও না দিনের সূর্যও না—'

ঘরে যা ছিল তাই খেতে দিল করবী।

'তারপর সকালে উঠে শুনব, হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে, সুষীমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কত খোঁজ-তালাস কত থানা-পুলিশ কোত্থাও না। এ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকবে, কেউ জানবেনা কেউ বুঝবে না। শুধু আমি সাক্ষী, আর সাক্ষী নদী আর সাক্ষী নৌকো, কিন্তু আমরা ঘূণাক্ষরে বলবনা কাউকে।'

কিছু খেয়ে কি না খেয়ে উঠে পড়ল আনন্দ। বললে, 'আমি এখন যাই।'

'সে কি, এখুনি চলে যাবে কী!' করবী বাধা দিতে চাইল।

'এখুনি বাবা বাড়ি ফিরবেন, কোথায় কী বাগড়া তুলে আটকে দেবেন আমাকে, ঠিক নেই।' আনন্দ চিন্তিত মুখে বললে, 'কে জানে হয়তো পাহারাই দিলেন সারা রাত।'

'আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখব।'

'কী করে পারবে লুকোতে? মেজদা জেনে গিয়েছে, সারা বাড়ি হৈ হৈ করে খুঁজে বেড়াবে। যে ঘরেই লুকোও, খিল রাখতে পারবনা বন্ধ করে। ধরা পড়ে যাব।'

'ধরা পড়লেই বা কী। বাড়ির ছেলে বাড়িতে এসেছে, এর বেশি তো কিছু নয়। সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবে—শুতে যাবে মানে মনে-মনে প্রহর গুনবে। ঠিক লগ্নে, ট্রেজারির ঘণ্টা বেজে গেলে, গুটি গুটি নেমে যাবে অন্ধকারে। আমি তো সারাক্ষণই সজাগ থাকব। তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়ো ঠিক জাগিয়ে দেব।'

হাসল আনন্দ। বললে, 'তাতে ব্যাপার আরো জটিল হয়ে উঠবে। আমি চলে যাই—'

'এতক্ষণ তবে কী করবে? পথে-পথে ঘুরবে?' কবরীর চোখে-মুখে উদ্বেগ।

'জানি না। একবিন্দু স্থির হতে পারছি না। একটা দুর্বার উত্তেজনা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বসতে দিচ্ছে না, শুতে দিচ্ছে না, দাঁড়াতে দিচ্ছে না পর্যন্ত।' উঠে পড়ল আনন্দ, এগুলো দরজার দিকে।

বিমর্ষ মুখে করবী বললে, 'তুমি চলে যাবে আর আমি আবার আমার পুরোনো অন্ধকূপের মধ্যে গিয়ে ঢুকব। আমার জীবনে যে সাময়িক একটু কল্পনার উত্তেজনা এসেছিল তা দেখতে দেখতে মিলিয়ে যাবে—'

'সবই ক্ষণজীবী। কল্পনা বলো, প্রেম বলো, বাঁচবার এই মহান উত্তেজনা বলো—সমস্তই চলে যাবার জন্যে। আমরাও চলে যাই—' বাইরে, অন্ধকারে বেরিয়ে গেল আনন্দ।

করবী আবার তার মলিন সংসারে গিয়ে ঢুকল। এক ঘর অভাব, আরেক ঘর অভিযোগের মধ্যে। তার সেই দুই ঘরের সংসারে। শোবার ঘরে আর রান্নাঘরে। আর আকাশ নেই, নদী নেই, সুর নেই, রঙ নেই, কিছু নেই—

ত্রিদিববাবু ফিরলেন।

'শুনলুম আনন্দ এসেছিল—কোথায় ?'

'চা খেয়ে বেরিয়ে গেল।' হেঁট মুখে বললে করবী।

'আবার আসবে বলেছে ? থাকবে রাত্তিরে ?'

'তা কিছু বলে নি।'

'এসেছে কেন, কী মতলব, তা কিছু ভেঙেছে ?'

'কিছু না।'

'শুনেছিলুম এমুখো আর হবে না কোনদিন। তবে এল কেন নির্লজ্জের মত ?'

করবী চুপ করে রইল।

'ঢুকতে দিলে কেন ? কেন বন্ধ করে দিলে না দরজা ?'

ম্লান একটু হাসল করবী।

'চা খেতে দেবার কী হয়েছিল !' ত্রিদিববাবু দাঁত খামাটি দিয়ে উঠলেন।

'খিদে পেয়েছে বলল যে ' গলা ছলছলে হয়ে উঠল করবীর।

'যে চাকরি-বাকরি করে না, পরের ঘাড়ে বসে যে খায়, তার অত খিদে কিসের ?' ত্রিদিববাবু এক পা এগিয়ে গেলেন করবীর দিকে। 'চেহারা কী রকম দেখলে ?'

'খুব খারাপ।'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ত্রিদিববাবু। তুমুল তুলো ধুনতে লাগলেন আনন্দকে। সে যে কত বড় অপদার্থ, মূর্খ, অকর্মণ্য—শুধু পরিবারের নয়, আধুনিক যুবশক্তির অপমান—প্রজ্জলিত হলেন বক্তৃতায়। হঠাৎ একসময় জিগগেস করলেন করবীকে, 'ঘরে মাছ-টাছ আছে ?'

'নেই।'

'আনন্দ যদি খেতে আসে তবে খাবে কী ?'

'আর সকলে যা খাবে তাই। ডালের বড়া।'

'কালীপদ তো এসেছিল সন্ধের মুখে। ওকে বললে না কেন বাজারে যেতে ?'

করবী চুপ করে রইল। পাশের ঘর থেকে কালীপদ বললে, 'একবার বলছেন বাড়িতে ঢুকতে দিলে কেন ? আবার বলছেন কেন মাছ আনতে পাঠালে না ? কোন দিক যে সামলাবে তা কে বলবে ?'

ত্রিদিববাবু আরেক প্রস্থ গর্জন ছুঁড়লেন কামানে। 'যদি বাড়িতে ঢোকা বন্ধই করতে পারত তা হলে কে মাথা ঘামাত মাছের জন্যে ? বলি, চা খাওয়াবার দরকার ছিল কী !'

যে যতই গর্জাক আর বর্ষাক মধ্যরাত্রি নিয়ে এল রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতার মন্ত্র। ট্রেজারির ঘণ্টা বেজে গেল। করবী ঘুমিয়ে পড়েছিল, শুনতে পেল না।

কিন্তু আনন্দের চোখে ঘুম কই ?

সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। বাড়ির কাছে গাছের আড়ালে। খিড়কির দরজার দিকে চোখ রেখে।

মধ্যরাত্রি কাকে বলে ? কতক্ষণ পর্যন্ত মধ্যরাত্রি ?

কই সুষীমা কই ? নিঃসীম মধ্যরাত্রি !

কতক্ষণ এমনি চোরের মত দাঁড়িয়ে থাকবে ? বিটের পুলিশ দেখতে পেলে পাকড়াও করবে নির্ঘাৎ। অন্তত থানায় নিয়ে যাবে। না নিয়ে গেলেও ভণ্ডুল করে দেবে খেলা। জানলা থেকে পুলিশ দেখলে আর সুষীমা আসবে না। কেউ আসে না।

পুলিশ নাই আসুক, আনন্দর এত কাছাকাছি থাকাটাও বোধহয় অস্বস্তিকর লাগছে সুষীমার। আনন্দ বরং নদীর দিকটাতেই থাকুক, একটু অসংলগ্ন হয়ে, অস্পষ্ট হয়ে, তা হলেই সুষীমা আপন মনে নিজের মুহূর্ত খুঁজে বেরিয়ে আসতে পারবে। একসঙ্গে আর পথটুকু হাঁটতে

হয় না ঘেঁষাঘেঁষি করে—একেবারে নদীর ঢালের কাছে এসে সামিল হতে পারবে।

তাই ভালো। নদীর দিকেই পা চালাল আনন্দ।

কয়েক পা যেতেই মন আবার বেসুর ধরল। কাছাকাছি না থাকলে সুষীমা যদি সাহস না পায়। দূরে গিয়ে দাঁড়ালে যদি মনে করে সে সমস্ত দায়িত্বের থেকেই দূরে সরে গেছে। তা ছাড়া সত্যিই যে সে এসেছে, প্রতীক্ষা করে আছে, ওর নির্বাচিত মুহূর্তটিতে. যদি ও তা দেখতে না পায় দূর থেকে, ঠিক-ঠিক না অনুভব করে। আনন্দ আবার ফিরে চলল গাছের নিচে।

হঠাৎ একটা ঢিল তার পায়ের কাছে এসে পড়ল।

ঢিলের গায়ে একটা কাগজের টুকরো সুতো দিয়ে বাঁধা। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিল ঢিলটা। জড়ানো সুতোটা আলগা করে কাগজের টুকরোটা আলগা করে নিল। নিঃসংশয় চিঠি একটা। চিঠি দেখে বুকের ভিতরটা ম্লান হয়ে গেল আনন্দর। চিঠি যখন তখন নিশ্চয়ই আর আসবে না সুষীমা। আর কেন আসবে না তারই কৈফিয়ত ঐ চিঠি। চিঠি না হয়ে যদি অমনি করে সুষীমা নিক্ষিপ্ত হত। যদি দুহাতে করে বুকের মধ্যে তাকে লুফে নিতে পারত শূন্য থেকে।

অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না চিঠির অক্ষর—কী না জানি আছে চিঠিতে—তবু—খানিকক্ষণ বাড়ির কাছে-কাছে গড়িমসি করল আনন্দ। হয়তো চিঠিতে লেখা আছে, ঘণ্টাখানেক আরো দেরি হবে বেরুতে, কিংবা শেষ রাত্রে, ভোর রাত্রে এস, কাক-কোকিলের ঠিক ঘুম-ভাঙার মুহূর্তে।

তবু আরো, আরো কতক্ষণ টহল দিল আনন্দ। স্থলে জলে অন্তরীক্ষে একটি পায়ের শব্দও শুনতে পেল না।

ট্রেজারিতে একটার ঘণ্টা পড়ল। সেই একটা ঘণ্টা যেন প্রকাণ্ড একটা না-র মত বুকে বাজল আনন্দর।

হাঁটতে লাগল আলোর সন্ধানে। অনেক দূরে দেখল রাস্তার পাশে এক দোকানে আলো জ্বলছে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগুলো দোকানের দিকে। কে জানে দেরি করবার জন্যে হয়তো কোন এক সোনার সুযোগ খসে গিয়েছে। হয়তো চিঠিতে লেখা আছে, আর কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার কথা, আর কোনো ইঙ্গিতে স্পন্দিত হবার নির্দেশ। কে জানে কী ভুল না জানি সে করে ফেলেছে এতক্ষণ চিঠিটা না পড়ে। কোন সোনার সুযোগ না জানি উড়ে গিয়েছে বাতাসে।

দোকানের আলোতে চিঠিটা পড়ল আনন্দ।

'তুমি কেন খালি হাতে এলে? আমার জন্যে বিষ কই? কই বা সেই মধুরের মদিরা? শোনো, আরো দিন পনেরো-কুড়ি সময় আছে, এর মধ্যে যে করে পারো চাকরি যোগাড় করো। তারপরে এস সেই জয়পত্র নিয়ে। বাইরে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? প্রবল দর্পে সমুখের দুয়ার দিয়ে আসবে। দস্তুরমত দুর্বার শক্তিতে ছিনিয়ে নেবে আমাকে। আমি যদি মন করি কে আমায় আটকায়? কে বা আমাকে বাধ্য করে? আমার নয়নসুখ আনন্দ, একটুকু একটু বাসা, একটি কোমল বিছানা আর কিছু উষ্ণ খাদ্য—সবে মিলে যার দাম বড় জোর দেড়শো টাকা। আনন্দ, তুমি এত পারো, সামান্য একটা দেড়শো টাকার চাকরি যোগাড় করতে পারো না? খুব পারবে, আমি জানি কিছুই তোমার অসাধ্য নয়। তাই নিয়ে এস লক্ষ্মীটি। নির্মম মধ্যরাত্রিও তোমার, যেমন তোমার নিষ্ঠুর দ্বিপ্রহরও। আনন্দ, তুমি আমার প্রত্যেক মুহূর্তের যন্ত্রণা।'

সকালবেলা ব্যগ্র-ব্যস্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে করবী, হঠাৎ দেখতে পেল জানলায় দাঁড়িয়ে আছে সুষীমা।

চোখে চোখ পড়তে দিব্যি হাসল মিষ্টি করে।

হাতের কাজ ফেলে ছুটে চলে গেল করবী। সুষীমাকে পাকড়াও করল। বললে, 'সে কি, যাওনি?'

বিষাদঢালা মুখে সুষীমা বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

আট

পত্রিকায় বিজ্ঞাপনেও কোনো ফল নেই, কটা লোক বা পড়ে চাকরি দেবার বিজ্ঞাপন। অথচ যে ভাবে হোক বিজ্ঞাপন ছাড়া আর পথ কি। যদি জনে-জনে সকলের হৃদয়ে এই আর্তি সে পৌঁছে দিতে পারত, সুফল কোথাও না কোথাও ধরত হয়তো।

রেডিওর স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করল আনন্দ।

'স্যার, আমি একটা প্রোগ্রাম পাই না?'

স্যার, আপনার কোলে একবার বসতে পাই না? ডিরেক্টর বদান্য লাহিড়ির কানে এমনি শোনাল।

'আপনি কে?'

'আমি কেউ না।'

'কেউ না?'

'মানে ভিপ না।'

'বলতে চান ভি-আই-পি না?'

'হ্যাঁ, ভেরি ইডিয়টিক পার্সন না। আমি একজন সাধারণ আইনের ছাত্র।'

'কী চান আপনি ? কিসের প্রোগ্রাম ? গান গাইবেন ?'

'না, ছোট্ট একটা বক্তৃতা দেব।'

'বক্তৃতা ?'

'ঐ যাকে আপনারা টক বলেন। দশ মিনিট না দেন, পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিটও পাই কি না পুরো'—

'আপনার টক শুনবে কে ?'

'যারা তখন টিউন-ইন করবে তারাই শুনবে।'

লাহিড়ির মনে হল ছেলেটা বোধ হয় অপ্রকৃতিস্থ। জিগেগস করলে, 'কী বিষয়ে টক দিতে চান ?'

'আমাকেই যদি নির্বাচিত করতে বলেন তো বলতে পারি, টকের বিষয় "ছাত্র ও আইন।" আজকাল ছাত্রদের আইন মানা সম্বন্ধে তো বটেই আইন পড়া সম্পর্কেও বৈমুখ্য এসেছে। আইন পড়া যে কেন উচিত আইন পড়তে শিখলেই যে বুদ্ধির সত্যিকার বিকাশের সম্ভাবনা সেইটেই সাব্যস্ত করা।'

'তা দেশে কত বড় জুরিস্ট আছেন তাঁদের না ডেকে এ বিষয়ে কথা বলতে আপনাকে ডাকব কেন ?'

'জুরিস্ট-টুরিস্টরা থাকুন, আমি সাধারণ সহজবুদ্ধি এক ছাত্রের দিক থেকে বলব। আর আইন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মানুষের কমনসেন্সের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এক ছাত্র ছাত্রদের আইন পড়তে বলছে, আইন মানতে বলছে, এ ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটু অভিনবত্ব পাচ্ছেন না ?'

'অভিনবত্বই তো বড় কথা নয়।' লাহিড়ি বিরক্ত হয়েও বিরক্ত হতে পারছেনা।

'বড় কথা হচ্ছে পটুত্ব, বড় কথা হচ্ছে প্রসিদ্ধি। কিন্তু যে প্রসিদ্ধ নয় তারও পটু হতে কিছু বাধা নেই। বলুন, আছে বাধা ?'

'তা হয়তো নেই। কিন্তু আপনার লেখার নমুনা পাব কোথায় ?'

'এই যে লিখে পকেটে করে নিয়ে এসেছি।'

যেন আশ্বস্ত হল লাহিড়ি। বললে, 'বেশ রেখে যান। নাম ঠিকানা দেয়া আছে তো ? চিঠি লিখে জানাব আপনাকে।'

হাসল আনন্দ। বললে, 'কী যে জানাবেন তা তো জানা আছে। সুতরাং চিঠির জবাবে দরকার নেই। আপনার যাকে দেখাবার হয় দেখান নয় আপনি নিজেই দেখুন, আর আমাকে বলে দিন কবে বলতে পাব ও কখন ?'

'এত তাড়া ?'

'হ্যাঁ, এত।'

'কেন বলুন তো ?'

'বুঝতেই পাচ্ছেন, টাকা, কিছু টাকার দরকার—'

'কত টাকা আপনি আশা করেন ?'

'দশ-পনেরো-কুড়ি।'

কী রকম নতুন লাগল লাহিড়ির। একটু বা করুণা হল।

লেখাটা পড়ে নিল এক নজর। বললে, 'খুব খারাপ হয়নি তো—'

'দেখুন যুক্তি, যুক্তিরই জয় সংসারে। এমন যে ভালোবাসা তার পিছনেও সূক্ষ্ম যুক্তি, বৈজ্ঞানিক যুক্তি কাজ করে। এ প্রেমে সুবিধে কতটুকু, সুনাম কতটুকু, সুখ কতটুকু তার চুলচেরা হিসেব। দোষগুণের কথা নয়, স্বভাবের কথা। আর এ যুক্তির তীক্ষ্মতম চূড়াই হচ্ছে আইন। যেমন প্রকৃতির জগতে শৃঙ্খলা তেমনি মানুষের জগতে বিধি বা আইন—'

'বেশ, দেব আপনাকে একটা দশ মিনিটের টক।' লাহিড়ি সার্থকনামা হলেন।

'আর দয়া করে আজ-কালের মধ্যে।'

'সে কি ? খেতে পেলেই দেখি শুতে চান।'

'এবং শুতে পেলেই ঘুমুতে আর ঘুমুতে পেলেই নাক ডাকতে।'

কী সব পরামর্শ করবে লোকজন ডেকে পাঠালেন লাহিড়ি। ঠিক হল তিন দিন বাদে সন্ধ্যা সাতটার সময় দশ মিনিটের জন্যে আনন্দ টক দেবে। ভাষণের বিষয় : ছাত্রের চোখে আইন।

কন্‌ট্র্যাক্ট সই হয়ে গেল।

'আপনার কাছে স্ক্রিপটের নকল আছে তো ?'

'আছে।'

'তাই নিয়ে আসবেন যথাসময়ে।'

'আসব।'

নির্ধারিত দিনে সময়ের বেশ কিছু আগেই পৌঁচেছে আনন্দ। একবার পড়ে মহড়া দিয়ে নিয়েছে, গলা দরাজ না বেখাপ্পা। বেশ, বেশ উতরোবে। লেখাটুকু তো সত্যি অসাধারণ।

ঘরে মাইকের সামনে বসেছে আনন্দ। সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে ঘড়িতে। লাল আলো জ্বলে উঠল।

স্ক্রিপটা সামনে রেখে বলতে লাগল আনন্দ : 'আমার দেশবাসী যে যেখানে আছেন ও এখন শুনছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি ব্যাকুল হয়ে আবেদন করছি, আমার এক্ষুনি কম পক্ষে দেড়শো-দুশো টাকা মাইনের একটি চাকরি দরকার। যদি কেউ পারেন আমাকে লিখবেন, ডেকে পাঠাবেন। ঘোরতর দারিদ্র্যে ও দুর্ভাগ্যে আমি ডুবে আছি, চাকরি না পেলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। আমার নাম আনন্দগোপাল মিত্র। ঠিকানা হার্ডিঞ্জ হসটেল, রুম নম্বর আঠারো।'

কর্তৃপক্ষের মুখ চাওয়াচাওয়ি ও বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই বলাটুকু শেষ করেছে আনন্দ।

পরে সুইচ অফ করলে হবে কি।

হৈ-হৈ ব্যাপার।

'এর মানে ?' কারা এসে ধরল আনন্দকে।

'বক্তব্যকে এর চেয়ে আরো স্বচ্ছ করা যায় কিনা ভাবতে পারি নি—' তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল আনন্দ।

'কী বলবেন আর কী বললেন, চুক্তিভঙ্গ করলেন যে—'

'যে ভাগ্য সারাক্ষণ আমার সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করছে তার খোঁজ কে করে!'

আনন্দকে নিয়ে কী করা যেতে পারে, পুলিশে দেওয়া চলে কি না, নাকি অন্য কোনো প্রতিকারের পথ আছে, কর্তৃপক্ষের ভেবে কিছু স্থির করবার আগেই আনন্দ বেরিয়ে গেল।

ঘরে ঘরে কত লোক শুনল আনন্দের আবেদন, হাসিতে বিস্ময়ে সকলে চঞ্চলমুখর হয়ে উঠল, চারদিকে কত কথা কত উত্তেজনা, কিন্তু এত আনন্দের পরেও আনন্দঘন চাকরির দেখা মিলল না।

না, এসেছে একটা চিঠি। এ কি, ক্ষুদ্র তিন সপ্তাহ সময় থেকে আরও ক'টা দিন কেড়ে রেখেছে দেখি!

ছাপানো চিঠির সঙ্গে এ আবার কার একটু হাতের লেখার টুকরো ?

সকলের সামনেই কথা হচ্ছিল সেদিন। সুব্রতা বললে, 'আনন্দকে একটা খবর দিই ? কত খাটাপেটা করতে পারত, কত যোগাড়যন্ত্রের মন্ত্র জানা ছিল তার—'

সুধীন ধমকে উঠল: 'বিয়ে তো আর এখানে হচ্ছে না—'

'হ্যাঁ, কলকাতায় তাকে চেনে কে। এ তো আর মফস্বলী বিয়ে নয় ?' জুড়ল আরতি।

'তা ছাড়া মেয়ের যদি কোনো প্রাক্তন বন্ধু থাকে তাকে কোনো কিছু জানতে না দেয়াই সঙ্গত।' আরতির স্বামী চলে এসেছে, এ তার কথা।

'মেয়েই জানাতে পারবে যদি ইচ্ছে করে।' বললে আরতি।

'মেয়ের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।' মেয়ের সমস্তই তার জানা এই ভাব থেকে বললে সুব্রতা।

'তবু মেয়ের দিকে নজর যেন একটুও না শিথিল হয়।' গম্ভীরমুখে আরতির স্বামী পরামর্শ দিল।

'সুষীমা অত বোকা নয়, তার মাত্রাজ্ঞান আছে বলেই তো তার নাম সুষীমা হয়েছে।'

তবু কী জানি, দৃষ্টিতে না আলস্য আসে, সুব্রতা দেখে আসতে গেল মেয়েকে।

দেখল স্নিগ্ধ দীর্ঘ আলস্যে খাটে শুয়ে সুষীমা উপন্যাস পড়ছে।

'আনন্দ কোথায় ?' জিগগেস করল সরল।

'বাপ-ভায়ের সঙ্গে তো ঝগড়া হয়েছে, তাই কত দিন তো এদিকে আসতে দেখিনি।'

'কলকাতাতেই আছে। কে জানে মোদের দাবি মানতে হবে বলে মিছিল বার করছে কি না।' স্বামীর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল আরতি।

'শুনেছি এর চেয়েও বিপজ্জনক শর্টকাটের পথও নাকি এর জানা।' আরতির স্বামী তাকাল সরলের দিকে।

সরল মুখ ফিরিয়ে রইল।

'যাক।' সমস্ত অবান্তর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেবার ভঙ্গি করল সুধীন। বললে, 'কে না কে এক দু দণ্ডের প্রতিবেশী, তাকে নিয়ে কালক্ষেপ। প্রথমে কি আর জানতাম ছেলেটা এমন একটা হতচ্ছাড়া ইডিয়ট—'

সরল উঠে পড়ল।

হন্তদন্ত হয়ে সুধীনও উঠল সঙ্গে-সঙ্গে। বললে, 'তুমি তো তখন

কলকাতায় থাকবে। তুমি কিন্তু যেও।' আরতিকে বললে, 'তোর বৌদিকে ডাক।'

ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে এল সুব্রতা। বললে অনুনয় করে, 'তুমি কিন্তু যেও। হ্যাঁ, একটা ছাপানো চিঠি নিয়ে যাও, তাতে বাড়ির ঠিকানা আর পথের নির্দেশ দেওয়া আছে। একটুও তোমার অসুবিধে হবে না। আমরা আজ-কালের মধ্যেই যাব কলকাতা। তোমাদের বাড়ি গিয়ে তোমার মাকেও বলে আসব। স্বদেশ-বিদেশে যেখানেই হোক তোমরাই আমার বল-ভরসা। কত রকম বিপদের কথা শুনি আজকাল—গা ছমছম করে। লোক তো আর প্রথমেই চেনা যায় না। কাছের লোককেই আপনার বলে মনে হয়। সেই যে আসলে পূজোর ফুল পাতার মধ্যে লুকোনো কেউটে—তা কী করে বোঝা যায় বলো—'

সেই ছাপানো চিঠিটাই সরল পাঠিয়ে দিয়েছে আনন্দকে। সঙ্গে কাগজের টুকরোতে বেনামীতে লিখে দিয়েছে: 'আপনি যাবেন, খাটাখাটনি করবেন, করিতকর্মা লোক আপনি, সমস্ত উৎসবকে সফল ও শ্রীমণ্ডিত করে তুলবেন এই সকলে আশা করছে আপনার কাছে। আপনি যেন পিছিয়ে থাকবেন না--'

একটা কেলেঙ্কারি হোক, সমস্ত কিছু ভুট হয়ে যাক লোপাট হয়ে যাক এই বুঝি চাইছে সরল। সত্যি যদি আনন্দ পুরুষ হয় যেন সহ্য করে না এ অপমান, চরমতম ঝুঁকি নিয়ে দুর্দান্ত হাতে সমস্ত সাজসজ্জা ও লোকলজ্জাকে নয়-ছয় করে দিয়ে আসে।

ছাপানো চিঠিটা পড়ে আনন্দের মনে হল চারদিকে এ যেন গতিদ্যুতিমুখর উজ্জ্বল দুপুরের শহর নয়, যেন ইটের অট্টহাস্য। যেন নির্জন হয়ে গেছে সমস্ত, রাত হয়ে গেছে, অকালে নিদারুণ শীত পড়ে গিয়েছে, তীক্ষ্ণ আর হিমেল হাওয়ায় অট্টালিকার কঙ্কালের পাঁজরে হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

আরো একটা চিঠি এসেছে।

মেয়েলি হাতের লেখা—এ আবার কার চিঠি? অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল করবী লিখেছে। কোনোদিন লেখেনি জীবনে। আজ এমন কী ঘটল যে বউদি পর্যন্ত চঞ্চল?

'ঠাকুরপো, সেদিন সুষীমা নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিল। তুমি ওর এই অহঙ্কারের ঘুম ভেঙে দাও জোর করে। তুমি এই প্রত্যাখ্যান সহ্য কোরোনা। সমস্ত মেয়েজাতের হয়ে আমি তোমার কাছে বিচার চাচ্ছি। তুমি ওর সমস্ত ঔদ্ধত্য বিধ্বস্ত করো। সব ভণ্ডুল করে দাও। প্রতিশোধ নাও। আমার শুভকামনা তোমাকে ঘিরে থাক। বৌদি।'

আবার তাকাল বাইরে। একটা হাউই অন্ধকার আকাশে নিবে যাবার আগে যেমন কতগুলি আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দেয় তেমনি যেন একটা চিৎকারের হাউই ফেটে যাবার পরে এই ক'টা শহরস্ফুলিঙ্গ!

বাইরে বেরিয়ে পড়ল। চারদিকে তাকিয়ে মনে হল সর্বত্রই যেন যন্ত্রণার প্রতিচ্ছায়া। যত গতি সব যেন কোথায় গিয়ে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হবার জন্যে নিক্ষিপ্ত তীর। যত স্মৃতি সব যেন যন্ত্রণায় আলোড়িত হবার জন্য নির্লিপ্ত প্রতীক্ষা। সমস্ত আকাশ পৃথিবী মিলে আনন্দের মনে হল, একটা যেন নিটোল রত্ন আর তার থেকে যে রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তারই নাম যন্ত্রণা।

কোথায় যায়, কোথায় ঘোরে, কোথায় বসে, কী করে, কাঁদে না হাসে, না চেঁচায় না ছোটে—কিছুই যেন ভেবে উঠতে পারেনা। তার শরীর থেকে অস্তিত্বের পাতাগুলি যেন কোন শীতার্ত হাওয়ায় নিমেষে ঝরে খসে উড়ে গিয়েছে।

পকেটের মধ্যে নিমন্ত্রণের ছাপানো চিঠিটা ছিল, তাই আরেকবার দেখে নিল।

খুঁজতে-খুঁজতে বিকেলের প্রান্তে এসে বার করল বাড়িটা। বিরাট

প্যাণ্ডেল উঠেছে। আলোর মালা ঝুলছে গলায়। চারদিকে কোলাহলের, ব্যস্ততার উল্লাস। আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে নিমন্ত্রিতদের। সাজসজ্জায় ঘনীভূতা মহীয়সী রূপসীরাও আসছেন কেউ-কেউ।

কোনোক্রমে একবার সুষীমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয় না? দুই বাতায়নে দাঁড়িয়ে প্রভাত আর রাত্রি, জীবন আর মৃত্যুর দেখা? তারপর একত্র হয়ে যখন মিশে গিয়েছে, যেখানে আলো নেই অন্ধকার নেই চাঞ্চল্য নেই বিরতি নেই সেখানে সেই সূচ্যগ্র চেতনার বিন্দুতে হতে পারেনা উন্মোচন?

চতুর্দিকে ঘেরাটোপ, শুধু অবরোধের প্রসারিত তর্জনী।

সেই তপ্ত ঘেরাটোপের মধ্যেই দেখা হল দুই বাতায়নবাসীর। সুষীমার আর অজয়শঙ্করের।

কেউ কাউকে দেখবে না, কিন্তু ঠাণ্ডা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরস্পরের মনে হল যেন এমন কোনদিন দেখেনি, পরস্পর যে এত পরিচিত কেউ হতে পারে তাই যেন জানেনি তারা কোনোদিন।

সম্প্রদানের পর বর-কনে আবার যাচ্ছে বাড়ির মধ্যে। আগে পিছে অনেক ডালা-চুলো, যাচ্ছে একটা সরু গলি পার হয়ে, এমন সময়ে আগুন লাগল।

কোথায় আগুন? প্যাণ্ডেলে।

মুহূর্তে দক্ষযজ্ঞের কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। তালগোল পাকিয়ে গেল অন্ধকারে।

স্তম্ভিতের মত এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল আনন্দ। আশ্চর্য, কি করে লাগল এই আগুন!

যদি লাগলই, আরো খানিকক্ষণ পরে লাগল না কেন?' একবার সুষীমাকে সে দেখে নিত মুখোমুখি। তার জিজ্ঞাসু চোখ একবার রাখত

তার চোখের উপর! জীবন সত্যি কী চায়?' কিসের তার আকাঙ্ক্ষা?' শুধু সচ্ছলতা, নিরাপত্তা? শুধু কূপবদ্ধ মণ্ডূকের শান্তি?' শুধু একটা বিধিসম্মত পরিমিত রোমাঞ্চ? যৌবনও কি তাই চায়? তবে কি মেয়েদের যৌবন বলে কিছু নেই? ওদের কি জন্ম থেকেই জীবনের সঙ্গে মীমাংসা? যে জীবন নিষ্কণ্টক, ছায়াভরা, আপাতরম্য?

বিয়ে বাড়িতে পৌঁছুতে দেরি হয়ে গিয়েছিল আনন্দর। আর পৌঁছুতে না পৌঁছুতে এ কী অভ্যর্থনা!

যখন মুখচন্দ্রিকা হচ্ছিল তখন ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে গিয়ে পড়তে পারলেই ভালো ছিল। তার জীবনের পাশে সুষীমা দেখতে পেত তার মৃত্যুকে। তার সমস্ত পাত্রের অপূর্ণতাকে, তার সমস্ত ক্ষুধার অতৃপ্তিকে, তার সমস্ত চেষ্টার অসাফল্যকে।

কিন্তু আনন্দ সুষীমাকে দেখল না, দেখল আগুন।

দেখল তার নিজের অতৃপ্তি, নিজের অপূর্ণতা, নিজের অসাফল্য।

আর আগুনের পরেই এক নিরর্থক অন্ধকার।

কেউ বললে, 'শর্ট সার্কিট হয়েছে।'

কেউ বললে, 'কে জানে, কেউ আগুন লাগিয়ে দিল নাকি!'

মনে-মনে হাসল আনন্দ। হয়তো তারই রক্তের নির্লজ্জ দাহ আগুন হয়ে জ্বলেছে। আরো চাই, আরো আরো দাও, লেলিহান শিখার এই তো চিরন্তন কামনা। সেই শিখা তো তবে আনন্দরই আকাঙ্ক্ষার ভাষা। ঊর্ধ্বের দিকে উত্থিত প্রার্থনা।

আগুন নিবে গেল। ছড়িয়ে পড়ল বাঁশ-কাঠ-দড়ি-মাদুরের অট্টহাসি।

'কেউ জখম হয়নি তো!' অন্ধকারে কে কাকে জিগগেস করল।

'ঈশ্বরের অশেষ করুণা বলতে হবে, কেউ না।'

'বর-কনে?'

'তারা তো মন্ত্রপূত। তাদেরকে কে স্পর্শ করে?' ভিড়ের মধ্য থেকে উত্তর করল আরেকজন।'

সহসা আনন্দর মনে হল, এ কি অন্ধকার, না, কি এ ঈশ্বরের বিদ্রূপ!

সুষীমার মুখখানি আজ তার দেখতেও বারণ। তার চেয়ে, বরং এই অন্ধকার দেখ—যে-অন্ধকার সব কিছুর উন্মোচন।

অন্ধকারের মধ্য দিয়েই ফিরে চলল আনন্দ।

অন্ধকার গলির মধ্যে সেই স্বল্পক্ষণের গহ্বরের ধারে দাড়িয়ে থর-থর করে কাঁপছিল সুষীমা। পড়ে যাচ্ছিল বোধ হয়, অজয় তাকে গায়ের কাছে টেনে ধরল।

সুষীমা বললে, 'আমার ভীষণ ভয় করছে। কী হবে?'

'বিয়ে তো হয়েই গিয়েছে। আর ভয় কী!'

'তবু—' কি রকম যেন করছে সুষীমার।

'না, ভয় কী! আমিই তো আছি—'

পরিপূর্ণ সমর্পণে তাকাল সুষীমা:

'আগুন বেশি ছড়াতে পারে নি। আগুনের গুণই এই, আগুনের চেয়ে গোলমাল বেশি। আর আগুন নেববার পরেই ফায়ার ব্রিগেড।' হাসল অজয়। বললে, 'দড়ির বাঁধন ছিঁড়তে পারে আগুন, কিন্তু আঁচলের এ গ্রন্থিটুকু নয়।'

সুষীমার মনে হল আগুনের গন্তব্যের মধ্যে বা কী নির্মল শান্তি!

বাসরের শেষ প্রহরে নির্জন হয়েছে বর-বউ।

তবু এখনো সুষীমার ভয়। কে যেন আসছে ছোরা হাতে, তার উদ্বেল বুক রক্তে ফেটে পড়ছে, কে যেন তার মুখে ছুঁড়ে মারছে এসিডের শিশি, তার লাবণ্যকে ক্ষতবিক্ষত করে বের করে দিচ্ছে বীভৎস ভীরুতা।

কাঁপছে, তবু থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে সুষীমা।

দুই ব্যাকুল হাতে বুকের উত্তপ্ত নিবিড়ে তাকে টেনে নিল অজয়। বললে, 'কিসের ভয়? আগুন টাগুন তো কখন নিবে গিয়েছে, কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই, এলোমেলো নেই—সব শান্তি সব সুখ—'

অজয়ের বুকের মধ্যে মুখ রাখল সুষীমা। বললে, 'তবু ভয় যায় না।'

'বা, আমি আছি না? আমি আছি বলেই তো আমি এসেছি। তোমাকে ডাকতে, ঢাকতে, রাখতে আমিই তো একমাত্র।' মুখে হাত বুলিয়ে একটু আদর করল অজয়। বললে, 'আর কি এক জন্ম আছি? লাখ লাখ জন্ম। যতদিন সময় থাকবে, সময় চলবে, আমরা থাকব আমরা চলব—'

কতক্ষণ পরে শান্তিতে গভীর নিশ্বাস ফেলল সুষীমা। বললে, 'তুমি তো বিয়ের আগে আমাকে একবারও দেখতে চাইলে না।'

শব্দ করে হেসে উঠল অজয়। বললে, 'দেখতে চাইব কেন!' কী হত দেখে?'

'আমি পছন্দের কি অপছন্দের একবার যাচাই করে নেওয়া দরকার ছিল না?' মুখটা আবার অজয়ের বুকের কাছে নিয়ে এল সুষীমা। 'আমি দেখতে কুচ্ছিত, না, অন্তত চলনসই, একটু দ্বিধারও কি অবকাশ ছিল না?'

'না।' আবার উচ্চে হাসল অজয়। 'কী করে থাকবে!' তোমাকেই তো আমি চিরন্তন কাল চেয়ে এসেছি, তোমাকেই তো আবার পেতে হবে—তোমাকেই—'

'আমাকেই চেয়ে এসেছ?' ভীরু-ভীরু দুষ্টু-দুষ্টু চোখে তাকাল সুষীমা।

‘ ‘ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে’—গানটা শোন নি ?’ ‘কত নামে ডেকেছি যে কত ছবি এঁকেছি যে’—কত বুকে রেখেছি যে—’ নিবিড় করে সুষীমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল অজয়। ‘সে তো আজকে নয়, আজকে নয়। তবে সেখানে আর নির্বাচন কী! তুমি তো নির্দিষ্ট। তাই তুমি পছন্দের কি অপছন্দের, এ প্রশ্নটাই অবান্তর। তুমি শুধু ছন্দের, জীবন-মৃত্যু শ্লোকের দুই চরণের নির্ভুল একত্র হওয়ার।’

‘কিন্তু আমি কি তোমার যোগ্য ?’ অজয়ের বুকের মধ্যে মুখ ডোবাল সুষীমা।

‘সে তো আমারও প্রশ্ন হতে পারে ? জানো’, সুষীমার মুখ নিজের মুখের কাছে তুলে ধরল অজয়। ‘প্রশ্ন আর এ নয় আমরা উপযুক্ত কিনা। এখন শুধু এই প্রশ্ন, আমরা সংযুক্ত কিনা, আমরা পারলাম কিনা সংযুক্ত হতে।’

‘আমার তবুও ভয় করে।’ সুষীমা আবার মুখ লুকোল।

হাসল অজয়। কবিতার মত করে বলল, ‘যত দূরেই যাই না কেন, যত দূরেই যাও না কেন, কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই। আর যদি দুঃখ মৃত্যু বিচ্ছেদ কোথাও না থেকে থাকে তাহলে ভয় কী, ভয় কোথায় ?’

না, ভয় কোথায় ! অন্ধকারে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল সুষীমা।

পথে-পথে রাত কাটিয়ে সকাল বেলায় আনন্দ ফিরল হস্টেলে। যেন জ্বলে যাওয়া ক্ষয় হয়ে যাওয়া একটা মশালের গাছ।

দেখল আরেকটা চিঠি এসেছে তার।

চৌকো নয়, লম্বা খাম।

খুলে দেখল সর্বেশ্বর ডেকেছে। তার চাকরি হয়েছে একটা দু’শো টাকার। এক্ষুনি এসে যেন জয়েন করে।

ছুটল সর্বেশ্বরের আফিসে।

সর্বেশ্বর নিজেই তাকে অভিনন্দন করল। বললে, 'কী হল? মিটল ষোল আনা? অফিসে জয়েনিং রিপোর্ট দিয়েই চলে যান আজ। বিয়ের তোড়জোড় সব কমপ্লিট করে ফেলুন। নেমন্তন্ন করতে ভুলবেন না যেন—'

লম্বা খামটা সর্বেশ্বরের টেবিলের উপর রাখল আনন্দ। বললে, 'চাকরিতে আমার আর দরকার নেই।'

'দরকার নেই? সে কি কথা?' সর্বেশ্বর তো বটেই, আশে-পাশের আর সকলেও হৈ-চৈ করে উঠল।

'না, আমি চাকরি করব না।'

'বলেন কী! একটা দুশো টাকার চাকরি!'

'না, ঐ সামান্য টাকাতে আমার কী হবে? আমার আরো অনেক, অনেক টাকার দরকার। আমি আইন পড়ব।'

বলে রিক্ত হাতে বেরিয়ে গেল আনন্দ।

নয়

দুপুরেব একলা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে অজয়কে চিঠি লিখছে সুষীমা। পাশেই খাটের লাগোয়া ছোট একটা রাইটিং-টেবিল, সেটা ছেড়ে দিয়ে খাটেই প্যাড-কলম টেনে এনে ঢেলে দিয়েছে পেলব নিভৃতি।

অজয় কলকাতায়, চাকরিস্থলে আর সুষীমা, পশ্চিমী শহরে, শ্বশুরবাড়িতে।

লিখতে লিখতে সুষীমা কখনো এলিয়ে শুয়ে পড়ছে কখনো আবার

উপুড় হয়ে জোড়া বালিশ বুকের তলায় নিয়ে মনোযোগ দৃঢ় করে অক্ষর সাজাচ্ছে।

উত্তেজিত অন্তরঙ্গ স্তব্ধতা।

লিখছে, স্নান করে এসে অবধি লিখছে ঃ

এই মাত্র স্নান করে এলুম। আমার স্নানের আরামও তুমি। হুড় হুড় করে মাথায় জল ঢালছি আর দেখছি গা বেয়ে জলের ধারা নামা। জলের ধারা গা বেয়ে নামতে গিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ভেঙে যায়, আর সেই গোল-গোল ফোঁটাগুলো শরীরের উঁচু-নিচুর উপর দিয়ে গড়িয়ে নামতে নামতে কেমন সরু হয়ে ছুঁচলো হয়ে ঝরে পড়ে—ভারি ভালো লাগে দেখতে। মনে হয় একেকটি ফোঁটা যেন একেকটি বিশ্ব, আর আমি যেন তাদের অধীশ্বরী—আমার এ শরীর যেন আকাশ, আর এত ভালোবাসা আমার শরীরে। কে জানে কোথা থেকে এত ভালোবাসা আসে আর কেমন করেই বা আসে। বিশ্বের প্রতি তৃণে আমার খুশি জ্বলে, প্রতি ফুলে আমারই আনন্দ ফুটছে বাড়ছে বিলোচ্ছে সুরভি পৃথিবীর সব আলো, সব বেলার আলো, আমার বুকের থেকে আমার চোখের থেকে ঝরছে। তোমাকে আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা কে ছড়িয়ে দেয় সবখানে, সব মনে, সব মানুষের মুখে!

এ তুমি, তুমি, তুমি। তুমিই এর কারিকর। দূরে থেকেও তুমি আমাকে ছুঁয়ে আছ, আর এমনি করেই গড়ছ, ভাঙছ, ছড়াচ্ছ ছিটোচ্ছ! রাত্রিদিন আমাকে নিয়েই তোমার খেলা, তোমার চপলতা। তোমার রসেই আমি ভরে থাকি, তোমার প্রেমেই আমি ঘুম যাই, তোমার আনন্দই আমার জীবনের একমাত্র ধন হয়ে ওঠে। কী আশ্চর্য আমি হয়ে উঠেছি, ছিলাম বদ্ধ গুহার জল, হয়েছি ঝর্না, ছিলাম দূর বনানীর রহস্য, হয়ে উঠেছি ফসলের খেত। আমাব চেয়েও তুমি বেশি আশ্চর্য।

আবার লিখেছে খেতে যাবার আগে ঃ

'কত রকম পাখি সকাল থেকে ঝাঁক বেঁধে আসে, নামে, ওড়ে, আকাশে পাখা মেলে ভেসে যায়। দূর তীরে সবুজ অন্ধকারে যেখানে একখানি কালো মেঘ আয়নার মত জলের সান্নিধ্যে এসে থমকে থেমে আছে সেখানে হঠাৎ তাদের ছন্দভরা পাখার মায়া ছড়িয়ে দিয়ে চলে যায় রোমাঞ্চিত অনির্দেশে। কত পাখি মরে যায় হয়তো, তবু তারা ফেরে না। মানুষের জীবনেও কি আছে এমনি সুদূরের রহস্যময় দুর্বার আহ্বান ?

এই-ই প্রেম। এ কেউ পায় না—কেউ না। এ প্রেম শুধু এক নিঃসঙ্গ ঝিনুকের বুকে একবিন্দু শিশিরের মত মুক্তো হয়ে জেগে থাকে, লাখ জনমে অশেষ ভাগ্যের প্রসাদে হয়তো তাকে খুঁজে পাওয়া যায়—আমি যেমন পেয়েছি। আমি তোমাকে ছোট্ট একটু ভালোবাসি, সেই মুক্তোর মত নিটোল, অটুট, অক্ষুণ্ণ ভালোবাসা। যে ভোরের পাখি প্রথম দিনের আলোটি ঠোঁটে করে উড়ে চলে গেল আকাশে সেই নিটোল ভোরের আলো। তারপর সমস্ত দিনের বিষণ্ণতার পর যে রাত সুশীতল প্রার্থনার মত জেগে থাকে সেই উজ্জ্বল অতৃপ্তি।

তোমাকে আমি কোথায় রাখি ? তুমি সব সময়েই উপচে পড়ছ, সব সময়েই বেশি হয়ে আছ। তুমি কেন এত বেশি হয়ে এলে ? আমি কেন সুন্দরী হলাম না—এ আর আমার নালিশ নেই। আমার সম্রাটপ্রতিম পুরুষের স্পর্শে আমি মর্তের উর্বশী হয়ে উঠেছি—আমি তার চেয়েও সুন্দরী। আমার মত কোনোকালে এমন ভালোবেসেছে কি কেউ ? কেউ কি খুঁজে পেয়েছে এমন পরিপূর্ণ দাক্ষিণ্যের সমুদ্র ? হঠাৎ বড় করে দেখবার দুর্লভ অনুভব ?'

তারপর খেয়ে-দেয়ে উঠে এখন আবার লিখছে ঃ

'একেক সময় আমার মনে হয় এত সুখ আমার সইলে হয় ! এত

সুখে আমি বোধ হয় মরে যাব। একবার এক কবির কবিতায় পড়েছিলাম, কোন এক যুবক সমস্ত সুখ যশ মান স্ত্রী সন্তান গৃহ ঐশ্বর্য পাবার পরে একদিন নির্জনে আত্মহত্যা করেছিল। আমি যেন বুঝতে পেরেছি কেন সে মরে গেল, জীবন যা দিতে পারে অথচ দেয় না তারই জন্যে তো মানুষের সংগ্রাম, প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্যে আকুলি-বিকুলি। প্রাণের নিরাবরণ ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে নিয়তির নিষ্ঠুরতাই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, লজ্জায় অপমানে লাঞ্ছনায় হতাশায় হাহাকারে প্রতিদিন মাটিতে লুটোচ্ছে, তবু মানুষ মরে যেতে পারে না।—'

হঠাৎ বাইরে থেকে জানলার খড়খড়ি খোলার মৃদু আওয়াজ হল।

চমকে তাকাল সুষীমা। লেখার সরঞ্জাম, কাগজের প্যাড আর কলম বালিশের তলায় লুকোল।

একতলা বাংলোপ্যাটার্ন বাড়ি। সামনে একটু কম্পাউণ্ড। গেট খুলে ঘাসী জমিটুকু পেরিয়ে প্রকাশ্যে আসা নয়, রাস্তা থেকে জানান দিয়ে গোপনে আসার অভিলাষ। চোর-ছ্যাঁচড় ছাড়া আর কে। তাও কী দুঃসাহস! ঘুমন্ত অন্ধকারে নয়, জাগন্ত দুপুর-বেলায়!

'এ কা, তুমি!' অস্ফুট বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুষীমা।

'দরজাটা একটু খুলে দেবে?' বাইরে থেকে করুণ ক্লান্ত স্বরে বললে আনন্দ, 'অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

হ্যাঁ, রাস্তার দিকে পাশ-দরজা আছে একটা। নিশ্চয়ই—দিব্যি খুলে দেওয়া যায়। একটা প্যাসেজের ওপারে শ্বশুর-শাশুড়ির ঘর। তার পিছনে দু দিকে ননদ-দেওরদের। গ্রীষ্মের দুপুরে সবাই এখন নিদ্রামগ্ন, নয়তো আলস্যে অন্যমনস্ক। ঠিক ওকে নিয়ে আসা যায়

ভিতরে। অন্দরের দিকের দরজাটা ভেজানো আছে, নিঃশব্দে খিল চাপিয়ে দিলেই হবে। পায়ের দিকের জানলা একটা খোলা। ওটাও বন্ধ করা যায় অনায়াসে।

এ অবস্থায় একদম না আসাই উচিত ছিল আনন্দর। কেউই আসে না। এত লজ্জা ও অপমান, লাঞ্ছনা ও হতাশার পর মুখ দেখায় না কেউ। তবু যখন এসেছে, এ দুপুরের নির্জনে আর যখন একান্তে একটু কথা বলতে বা কাছাকাছি হতে কোনো অসুবিধে নেই, তখন পাশ দরজাটা খুলেই দেওয়া যাক। যদি এত দূব এসে দেখা না পায় তা হলে ফল মোলায়েম হবে না নিশ্চয়ই। সুষীমা এখানে নেই, আর সেই কারণে যদি ফিরে যেত, আটকাত না। কিংবা গোড়াতেই সুষীমার সঙ্গে দেখা না হয়ে যদি শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা হত আর তিনি তাকে সোজা ফিরিয়ে দিতেন তা হলেও দোষের হত না হয়তো। কিন্তু এখন এ অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া সাজে না। বরং কী তার বক্তব্য, কী তার এখনো পেশ করার থাকতে পারে, জেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বরং তাকে শান্ত করা ভালো, নিরস্ত করা ভালো। সোজা কথায়, বোঝাপড়া করে ফিরিয়ে দেওয়া ভালো। যে করেই হোক তার স্ত্রীত্বকে বাঁচাতে হবে। আর স্ত্রীত্ব অর্থ স্বামীর কাছে সুনাম ছাড়া আর কী।

তেষ্টা পেয়েছে বলছিল না? ভয় পেলেও লোকে হাসে। সে হাসি হাসে ভয়কে তাড়াবার জন্যে। তেমনি করে মনে মনে হাসল সুষীমা। এক গ্লাস জলের পিপাসা হলে আর কোথাও বুঝি তার নিবারণ ছিল না, সুষীমারই দরজায় এসে দাঁড়াতে হবে প্রত্যাশা করে। আর এতদূর আসাই বা কেন? না, তবু, ভয় কী! উদ্যত ফণাকে বশীভূত করার মন্ত্র জানা আছে সুষীমার। শুধু একমুঠ ধুলো ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল। সে ধুলো অতীতের চোখে, হয়তো বা ভবিষ্যতের

চোখে। আনন্দর চোখে, হয়তো বা অজয়েরও চোখে। একজন মিলিয়ে যাবে আরেকজন জানতেও পারবে না ঘুণাক্ষরে।

পাশ-দরজা খুলে দিল সুষীমা।

ক্লান্ত, রুক্ষ, শীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন আনন্দ ঘরে ঢুকল। বললে, 'আমি এসেছি।'

'তাই তো দেখছি।' নির্মল কণ্ঠে বললে সুষীমা, 'এত দূর এলে।'

'আরো অনেক দূর যাব।' খাটে পাতা বিছানার উপরেই বসল আনন্দ। 'বেশিক্ষণ বসব না। বেশিক্ষণ বসবার সময় নেই।'

গভীর আরাম পেল সুষীমা। তবু নিশ্চিন্ততর হবার জন্যে অন্দরের দিকের দরজার খিল চাপাল। 'ব্রেক-জার্নি করতে নেমেছ বুঝি?'

'হ্যাঁ—না, জার্নিতে ব্রেক নেই, যাত্রায় যতি নেই, বিরাম নেই, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আমাকে?' নিমেষে শূন্য হয়ে গেল সুষীমা। 'কোথায়?'

'তা জানিনা। শুধু এইটুকু জানি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

'এই অসময়ে?' সুষীমা তাকাল নিজের দিকে।

'যেখানে যাচ্ছি সেখানে যাবার কোনো সময়-অসময় নেই। সব সময়েই তার ট্রেন-টাইম। প্রতি স্টেশনে গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা বেজেই চলেছে—'

কিছু বুঝতে পারছেনা সুষীমা। কিংবা বুঝেও বুঝতে পারছেনা। অসহায়ের মত বললে, 'আমি যে এখনো তৈরি নই।'

'কে বললে তৈরি নও? আমরা সব সময়েই তৈরি। এস। চলো।' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুষীমার চুড়ি-বালা-শাঁখাশুদ্ধ ডান হাতটা সজোরে চেপে ধরল আনন্দ।

'তারপরেই সব শেষ তো?' মুখে চোখে নির্ভয় হাসি ফুটিয়ে সুষীমা খাটের ধার ঘেঁষে এগিয়ে এল।

'সব শেষ।' আনন্দ চোখের দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ করল। 'কে জানে কী! না কি আবার এক নতুন আরম্ভ। কে জানে সে কী এক অসম্ভব চেতনা!'

সুষীমা কী বুঝল কে জানে, বলল, 'ছাড়ো। দূরের ঐ জানলাটা বন্ধ করে দিই।'

'না, না, জানলা কা দোষ করল?'

ছেলেমানুষকে যেমন বোঝায় তেমনি বোঝাবার চেষ্টায় সুষীমা গলার স্বর ঝাপসা করল। বললে 'একেবারে নিরাপদ হওয়া ভালো। নিশ্ছিদ্র নিশ্চিন্ত। জানলাটা বন্ধ করে দিলেই ঘর কেমন মিষ্টি-মিষ্টি অন্ধকার হয়ে যাবে। দিনের বেলায় এই কৃত্রিম অন্ধকার রচনাটি কী মধুর!'

'না জানলা বন্ধ করলে কি রকম রুদ্ধ-রুদ্ধ বন্দী-বন্দী লাগবে।' আনন্দ জানলা দিয়ে তাকাল একবার বাইরে। 'আলোর দিকে একটা পথ থাকা দরকার। শোনো,' হাত ছেড়ে দিল আনন্দে। বললে, 'একগ্লাস জল নিয়ে এস।'

'জল? শুধু জল? তোমার কি তুচ্ছ জলের পিপাসা?' ছাড়া পেয়ে ছুটে গিয়ে সুষীমা দূরের জানলাটা বন্ধ করে দিল।

ছায়া-ছায়া কেমন অপরূপ হয়ে উঠল সমস্ত। ঘরটা যেন সমুদ্রের তলায় লুকোনো কোন এক রহস্যের কৌটো।

চুল খসা, আঁচল এলোমেলো, কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে সুষীমাকে। যেন থেমে-থাকা ঝড়ভরা একস্তূপ মোলায়েম মেঘ। মাঝে মাঝে কটা বিদ্যুতের টান, চোখে বুকে বাহুতে কটিতে।

যেমন শ্রান্তের শরীরে ঘুম আসে, সেই দুর্বারণ ঘুমের মত এগিয়ে আসতে লাগল সুষীমা।

আনন্দ শান্ত স্বরে বললে, 'না, এক গ্লাস সামান্য জল দাও, ঠাণ্ডা জল। খাব।' চারিদিকে তাকাল। 'তোমার ঘরে কুঁজো নেই?'

'আছে। দিচ্ছি।' আলমারিটার পাশেই কুঁজো, ত্বরিত হাতে কাঁচের গ্লাসে জল গড়িয়ে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো সুষীমা।

গ্লাসটা হাতে নিয়ে আনন্দ বললে, 'এ জল তুমিও খাবে।'

'আমার জলের তৃষ্ণা নয়।' সুষীমা নীরবে পাগলের মত হাসল। 'আমার আগুনের তৃষ্ণা।'

'আগুনের তৃষ্ণা?'

'হ্যাঁ, আগুনের তৃষ্ণা। আর এ আগুনের নির্বাপণ, কে না জানে, জলে নয়, আগুনে। আগুনে আগুন দিয়া আগুন নিবাই।'

'কিন্তু আমি তোমাকে যে জল দেব সেই জল সমস্ত আগুন চির-দিনের মত নিবিয়ে দেবে।' আনন্দ জামার পকেটে হাত দিয়ে একটা পুরিয়া বের করল।

'এটা কী?'

'বিষ।' আনন্দ স্থির শান্ত মুখে বললে।

'বিষ?' প্রায় অর্তনাদ করে উঠল সুষীমা।

'হ্যাঁ, এর খানিকটা এই জলের মধ্যে মিশিয়ে দেব, তার পর তুমি এক ঢোঁক খাবে, আমি এক ঢোঁক খাব। নিবে যাবে সব রক্তাক্ত যন্ত্রণা। নিশ্বাস ফেলবার পরিশ্রম।'

'আমি আগে খাব?' যেন ভয়ের উপরে ভয় এমনি ভাব করল সুষীমা।

'বেশ তো আমি আগে খাব।'

'না, না, ওসব কিছু নয়, তুমি ঠাট্টা করছ।' সুষীমা আরো কাছে এগিয়ে এল। 'কি, তাই না?'

'ঠাট্টা করবার জন্যেই তো এতদূর এসেছি। তোমার সঙ্গে তো আমার ঠাট্টারই সম্পর্ক।'

'কই দেখি কেমন বিষ?' পুরিয়াটা কেড়ে নিতে আনন্দের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সুষীমা। পারলনা, নাগাল পেলনা। খানিকটা জল শুধু চলকে পড়ল বিছানায়।

'এখুনি দেখতে পাবে। আমি খেয়ে নেবার পর গ্লাসের বাকিটুকু যদি তুমি না খাও তোমাকে কিছুই বলতে আসবনা, বলবার অবকাশই বা কোথায়। কিন্তু এই আমার তৃপ্তি, আমি তোমার কথা রেখেছি।'

'আমার কী কথা?' আগুনের শিখার মত কাঁপতে লাগল সুষীমা।

'মনে নেই লিখেছিলে আমাকে, হয় আমার জন্যে মদ আনো

নয়তো মৃত্যু আনো।' ধ্যানীর দৃষ্টিতে তন্ময় হয়ে সুষীমার দিকে তাকিয়ে রইল আনন্দ। বললে, 'আমার কাছ থেকে আর মদ তো নিলে না, তাই মৃত্যু নিয়ে এসেছি।'

'কে বললে মদ নিলাম না?' চারদিকে আরেকবার ত্রস্ত চোখে তাকাল সুষীমা। দেখল কোথাও এতটুকু ভয়ের ছিদ্র নেই, নেই সন্দেহের উঁকিঝুঁকি। সর্বত্র নিরেট অব্যাহতি, নিরঙ্কুশ গোপনতা। 'দাও আমাকে সেই মদ। আমাকে সিক্ত করো দীর্ণ করো পূর্ণ করো।'

মুগ্ধের মত আনন্দ দেখতে লাগল সুষীমাকে।

'লিখেছিলাম না আমার রাত্রির অরণ্যের ঘুম ভেঙে দাও। লিখেছিলাম না শোনাও আমাকে সমুদ্রের গান। কিছুই মিছে লিখিনি। আমি সেই রাত্রির অরণ্য তুমিই সেই উদ্বেল নীলাম্বর।'

গায়ের কাছে সরে এসেছিল সুষীমা, আনন্দ তাকে ঠেলে দিল। বললে, 'না। আমি একবেলার চোর নই। আমি সেই রাত্রি নিয়ে কী করব যার চাঁদ খসে গিয়েছে। সেই অরণ্যে আর কী শোভা যার ফুলগুলি ঝরা, ডালগুলি বিষণ্ণ।'

'তবু অন্ধকার রাত্রি তো আছে। তার রহস্যই বা কম কী!' খাট থেকে নেমে পড়ল সুষীমা। গায়ের আঁচলটা ফেলে দিল। জামার বোতামে হাত দিল—এক, দুই বললে, 'মনে নেই তুমি একদিন অন্ধকারে আমাকে বলেছিলে, তোমার সকল বন্ধন আর গ্রন্থি আর আবরণ খুলে দাও একে একে। তুমি নির্মুক্ত হও, উদঘাটিত হও— তোমাকে দেখি। কী, মনে নেই?'

চোখ বুজল আনন্দ। বললে, 'না, আমার এখন আরেক রাত্রির পিপাসা, আরেক অন্ধকারের আরেক উন্মোচনের। আমি দেখব কী সেই রহস্য, কোথায় সেই শক্তি যে আমাকে আমার সত্তাকে প্রতি মুহূর্তের চঞ্চুতে কুরে কুরে খায়, স্থির থাকতে দেয় না, শান্ত হতে দেয় না, শূন্যের মধ্যে দিয়ে খালি ছুটিয়ে নিয়ে চলে,—লক্ষ্যহীন তীক্ষ্ণতায়। আমি দেখব কোথায় এই আদিম যন্ত্রণার মূল, কত দূরে!' চোখ মেলল আনন্দ। 'ঐটুকু উন্মোচনে কী হবে? চামড়া, মাংস, হাড়, মজ্জা,

রক্ত,—আরো গভীরে, আরো গহনে, কোথায়, কোথায় সেই অশরীরী কান্না ?'

ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে সুষীমা।

অস্থির হয়ে উঠল আনন্দ। বললে, 'একটা কাগজ কলম দিতে পারো ? তুমি যখন খাবে না, খেতে চাওনা, আমাকে একটা স্তোক দিয়ে নিজে বাঁচতে চাও, তখন, না, তোমাকে আর চঞ্চল করব না। তুমি শান্তিতে থাকো, মুক্তিতে থাকো। আমি চলে যাই। হারিয়ে যাই। যাই সেই অনাবিষ্কৃত দেশে যেখান থেকে লোকে আর ফেরে না।'

টেবিলের উপর গ্লাসটা রাখল। পুরিয়াটা হাতের মুঠোয়।

ঘরে ঢোকবার আগে আনন্দ চকিতে দেখেছিল সুষীমা কী লিখছে। আর তার সজাগ হবার পরেই লেখাটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলেছে বালিশের নিচে।

বালিশের তলা থেকে প্যাডটা বার করল আনন্দ। পড়তে লাগল :

'নিয়তির নিষ্ঠুরতাই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, লজ্জায় অপমানে লাঞ্ছনায় হতাশায় হাহাকারে প্রতিদিন মাটিতে লুটোচ্ছে, তবু মানুষ মরে যেতে পারে না—'

আশ্চর্য মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল সুষীমা। তাকে না পড়ে সামান্য একটা কাগজের পৃষ্ঠা পড়ছে, ভাবতে তার চোখে জল এসে গেল।

আনন্দ ঐ লেখার নিচেই লিখল: কিন্তু আমি মরলাম। স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে। কেউ দায়ী নয় আমার মৃত্যুর জন্যে। আমি একবার দেখি কী সে চেতনা, কী সে রহস্য—বস্তু, না সত্তা, না বিস্মৃতি !

লিখল আর বলল।

তবু অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল সুষীমা।

'আমার দিকে তাকাবে না ?'

'না, মৃত্যু তোমার চেয়ে সুন্দর, তোমার চেয়ে পবিত্র, তোমার চেয়েও আপনার—'

পুরিয়া থেকে একটু কি গুঁড়ো ঢালল গ্লাসে, এক চুমুক খেতে না খেতেই আনন্দ ঢলে পড়ল বিছানায়।

আগে শালীনতায় উপনীত হল সুষীমা। পরে দরজা খুলে সোর তুলল।

দশ

পুলিশ সাব্যস্ত করল আত্মহত্যা।

অজয় এসেছে কলকাতা থেকে। আর ত্রিদিববাবু।

মরে যাবার পরেও ছেলেকে বকছেন ত্রিদিববাবু। 'একটা চাকরি যোগাড় করতে পারল না। পরে শুনেছিলাম পেয়েছিল একটা, নিলনা। আর কোথায় কী চাকরি দেখল কে জানে। কাপুরুষ ছাড়া আর কে আত্মহত্যা করে? যে বীর যে সাহসী সেই বেঁচে থাকে। ল্যাজ গুটিয়ে পালায় না। একেবারে লঘুচিত্ত লক্ষ্মীছাড়া। ঈশ্বর আমাদের জেল দিয়ে পাঠিয়েছেন, এই দেহই সেই জেলখানা, আমাদের কোনো অধিকার সেই, সেই জেলখানার তালা ভেঙে পালানো। আগের জেল তো খাটবেই এখন আবার এই তালাভাঙার জন্যে নতুন জেলখাটা। একেবারে অপদার্থ- '

'কিন্তু কত বড় শক্তিমান বলুন তো, নিজের প্রাণ খুশিমত নিতে পারল নিজের হাতে। বাঁচা তো সহজ, মরাই কঠিন।' অজয় আনন্দের পক্ষ নিল: 'টু বি আর নট টু বি প্রশ্নের চরম উত্তর দিয়ে গেল এক নিমেষে। আর যাই বলুন, কাপুরুষ বলতে পারেন না—'

ত্রিদিববাবু শুকনো গলায় ঢোঁক গিললেন, 'কিন্তু আমাদের দু দুটো পরিবারের সম্ভ্রম কেমন বিপন্ন করল।'

'আমাদের পারিবারিক সম্ভ্রমের নিদর্শন স্বরূপ ও শুধু বেঁচে থাকবে এটাও ঠিক নয়।' অজয়ের মুখ সমবেদনায় কোমল হয়ে এল। 'কী অপূর্ব অনুভূতির সম্মুখীন হয়েছিল ও, সে কী সুখ না যন্ত্রণা, অমা না পূর্ণিমা, কী সে দেখেছিল, তার বিচার করি এমন আমাদের সাধ্য নেই। তাই সেই অনুভূতিকেও আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে হবে, নমস্কার করতে হবে—তাই ওর শবাধারে আমি একটু ফুলের মালা দিয়েছি—'

এমন ভাবের কথা শুনতে পাবেন ভাবেননি ত্রিদিববাবু। অবাক হয়ে অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'নমস্কার? যে জীবনকে ধুলোয় ফেলে কলঙ্কিত করে তাকে তুমি নমস্কার করবে?'

'জীবন কী? যতক্ষণ মৃত্যু না আসে ততক্ষণই জীবন।' বললে অজয়। 'আর মৃত্যু কী? বলুন মৃত্যুই কি জীবনের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সুন্দর য়্যাডভেঞ্চার নয়? ঊর্ধ্ব উদার অজানা বিপুলের অভিমুখে তার সেই যাত্রায় সে কি মহনীয় হবেনা?'

'কিন্তু পাবে কি সে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম?' ত্রিদিববাবুর গলা বুঝি একটু ধরে এল। 'পাবে কি সে ঈশ্বরের ক্ষমা?'

'সে ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বর বুঝবেন। কিন্তু জীবনে যেমন আমাদের বিশ্রাম নেই, তেমনি যেন মৃত্যুতেও না থাকে।' ঘরের মধ্যে একটু পাইচারি করে নিল অজয়। বললে, 'মরণ আর কী, থেমে থাকাই মরণ। তাই ছেলের প্রতি রূঢ় হবেন না, আমাদেরও মার্জনা করবেন।'

ত্রিদিববাবু ফিরে যাবার মুখে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অজয় তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

গাড়িটা কদ্দূর এগুলে, কী যেন মনে পড়ল ত্রিদিববাবুর, গাড়োয়ানকে ফিরতে বললেন। গাড়ি ফের বাড়ির দরজার কাছে আসতেই ত্রিদিববাবু নামলেন। দাঁড়ালেন দেয়াল ধরে, দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে। তারপর অবোধ শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন।

ইনভেস্টিগেটিং অফিসর একতাড়া চিঠি দিয়ে গেল অজয়ের হাতে। বললে, আনন্দের বাক্সে আর যা সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে, সামান্য কাপড় চোপড়, তা ত্রিদিববাবু নিয়ে গিয়েছেন। এই এক তাড়া চিঠি নিতে চাননি।

'কার চিঠি?'

'আপনার স্ত্রী যা লিখেছিলেন আনন্দকে—'

'কই, দিন।'

চিঠির তাড়া নিয়ে অজয় গেল সুষীমার কাছে।

ছন্নছাড়ার মত বসে আছে সুষীমা। একটা লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে নয়, একটা লোকের মৃত্যুতে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে বলে।

হাসতে হাসতে অজয় বললে, 'তোমার এ চিঠিগুলো দিয়ে আর কী হবে ?'

ম্লান চোখ নত করল সুষীমা।

'আমি বলি কি, এগুলি পুড়িয়ে ফেল।' সরলমুখে স্বচ্ছ স্বরে বললে অজয়, 'এগুলি তো তোমার কাছে থাকবার কথা নয়। এগুলি ইচ্ছে করলে আনন্দও পুড়িয়ে ফেলতে পারত। এগুলিতে তোমার কোনো অধিকার নেই। সুতরাং - '

উজ্জ্বল চোখে তাকাল সুষীমা। বললে, 'পুড়িয়ে ফেল।'

দেশলায়ের কাঠি জ্বালিয়ে অজয় ধরাল একটা চিঠি। পর-পর সব কটি।

কী আশ্চয, অজয়ের বিন্দুমাত্র কৌতূহল হলনা চিঠিগুলি পড়ে। এ চিঠি তো তাকে লেখা নয়। এ চিঠি পড়বার তাব অধিকাব কোথায !

শেয চিঠিটি পুড়িয়ে অজয় বললে, 'এই পযন্ত। আর অতীতকে পোড়ানো যায়না। পুড়িযে ফেলার দরকারও নেই। যেটুকু লেগে থাকে থাকতে দাও। পুরোনো দুঃখও একটা সুখ।' পরে সুষীমার হাতে সান্ত্বনার হাত বাখল অজয়। বললে 'তুমি তাব জন্যে এত বিমর্ষ কেন ? জীবন মৃত্যুর চেযেও বড়। মৃত্যুব রহস্যের চেয়েও জীবনের রহস্য আরো বেশি আশ্চর্য। জীবনেই মহত্তর উত্তেজনা। তোমার কিছুতে লজ্জা নেই, গ্লানি নেই। তুমি কোনো অপরাধ করনি। কেউই কবেনি। যা হবার হয়েছে। আর যা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি, যা হবে।' সুষীমাকে নিজের আরো কাছে টেনে আনল অজয়। 'একজন মরেছে বলেই আমরা পুরোপুরি বাঁচবনা এ হতে পাবে না। আর মরলই বা কোথায ? যদি মনে করে রাখো, যদি মনে করে রাখা যায়, তা হলে আর মরা হল কই ?'

'মনে করে রাখব ?' কৃতজ্ঞচোখে করুণ জিজ্ঞাসা নিয়েতাকাল সুষীমা।

'জোর করে মুছে ফেলা যায়না। যত জোর করবে তত আরো আঁকড়ে ধরবে। শুধু সময়েব হাতে ছেড়ে দাও। ঢেউ অতীতের কিন্তু বন্দর ভবিষ্যতের। সমুদ্রে অতীতের ঢেউ পেরিয়ে-পেরিয়ে আমরা পৌঁছুব ভবিষ্যতের বন্দরে এক বন্দর থেকে আরেক। এক বিচিত্র থেকে আরেক বিচিত্রে।'

আহত শাবক যেমন নীড়ের নিভৃতিতে এসে আশ্রয় পায় তেমনি স্বামীর বুকে উত্তপ্ত আশ্রয় পেল সুষীমা। বললে, 'আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে ?'

'ছি, ক্ষমা কিসের? তুমি কি অপরাধ করেছ যে ক্ষমা করব ? জীবন কি অপরাধ ? যৌবন কি অপরাধ ? যা এসেছে যা হয়েছে যা ঘটেছে তা তো জীবনেরই দান। জীবনকে সহজ ভাবে নাও, আর জীবনের কাজই হচ্ছে পদে পদে উপভোগের থালা সাজানো। মৃত্যু আর ব্যর্থতা, অপমান আর লাঞ্ছনা, প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্য, স্বপ্ন আর প্রেম, - কত তার উপাদান। শুধু উৎসব করে যাও। ক্ষুধিতকে সংসারে পাঠিয়ে ঈশ্বর কি আর বলতে পারেন, উপবাসী থাকো ? তাই যদি ক্ষণিকের পাত্রে মধু এসে থাকে পান করেছ – তাতে অপরাধ কী ?'

কিন্তু সংসারের চোখে, শ্বশুরবাড়ির কাছে সুষীমার অপরাধের অন্ত নেই। সে কলঙ্কিতা, পরঘাতিনী। শাশুড়ি বলছেন, কী বাজে-মার্কা মেয়ে—

শ্বশুর বললে, তখনই বলেছিলাম ভালো করে খোঁজ নাও।

'শত খোঁজ নিলেও কে জানবে কোন মেয়ের কোথায় গুপ্ত বৃন্দাবন।' শাশুড়ি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন : 'এ মেয়েকে বিশ্বাস কী ! গুপ্তের একবার যখন স্বাদ পেয়েছে আর কি সে তা ছাড়বে ? বারে বারেই এদিক ওদিক মুখ বাড়াবে ! কী অপদার্থ মেয়েই এসে জুটল অজয়ের অদৃষ্টে—'

'বউয়ের বাবাকে লিখে দাও।' শ্বশুর তর্জন করে উঠলেন। 'লিখে দাও এ অবস্থায় অজয় যদি আপনার মেয়েকে ত্যাগ করে তা হলে আশ্চর্য হবেন না।'

'লিখে দিয়েছি।' বললেন শাশুড়ি।

'কী লিখে দিয়েছ, মা ? আমি সুষীমাকে ত্যাগ করব ?' মাকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বিস্তৃত হল অজয়। 'ও কী অপরাধ করেছে ? প্রথম যৌবনে ওর জীবনে একটি ছেলের আবির্ভাব হয়েছিল, মুহূর্তের শিহরণে তাকে ওর লেগেছিল রাজপুত্র বলে, সমস্ত চেতনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, দিয়েছিল ভালোবাসা। আর সে উন্মাদ রাজপুত্র রহস্যের

পার পেতে ছিন্ন করতে গেল মৃত্যুর যবনিকা। তা সুষীমা কী করবে? জীবনে একটা মৃত্যুর ছায়া এসে পড়ল বলেই সে ফুরিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার দিন? আর কি তার স্থান নেই, গান নেই, বিস্তার নেই? বিন্যাস নেই? সে কি তবে শুধু এখন ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা হয়েই থাকবে? আর অদৃষ্টের কথা বলছ, মা? সে তো একজন্মের নিক্ষেপ নয়, নিত্যকালের নির্বাচন।'

'তবে যাও, ওকে নিয়ে আলাদা সংসার করোগে।'

সুষীমাকে কলকাতা নিয়ে এল অজয়। ছোট ফ্ল্যাটে দুজনের সংসার পাতল।

রৌদ্রকরোজ্জ্বলা হয়ে আছে সুষীমা। হয়ে আছে ভাস্বর সুন্দরী। পূর্ণতার প্রতিমা।

কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই ত্রুটি নেই, ন্যূনতা নেই। সব সময়েই জীবন্ত, স্ফুরন্ত, অফুরন্ত হয়ে আছে।

অজয় জিগেস করল, 'তোমার কাছে আনন্দের কোনো ছবি আছে? জীবন্ত ছবি?'

'না।' বলল সুষীমা।

'ছোট খাটো কি একটা ছিটেফোঁটাও নেই?'

'কী করে থাকবে? কদিনের বা আলাপ! একটা কালবোশেখি ঝড়ের মত এসে মুহূর্ত খরচ হয়ে বেরিয়ে গেল ফতুর হয়ে। এত অল্পক্ষণের সব কিছু!' তবু ভয় যায়না সুষীমার।

'অল্প বলেই তো এত সুন্দর। জানো কথা যত কম, প্রার্থনা তত জোরালো। তেমনি আয়ু যত কম, প্রেমও তত প্রগাঢ়। ভারি দেখতে ইচ্ছে করে আনন্দের ছবি।' বললে, ছবি না থাক, অন্য কোনো স্মৃতিচিহ্ন?'

'কিছু নেই।' সুষীমা নির্মমের মত বললে।

'কিন্তু তোমার মনের মধ্যে তো সে বেঁচে আছে। যদি ঢুকতে পারতাম তোমার মনের মধ্যে। দেখতাম সে কে মহান যুবক এমনি করে চরমের সন্ধানে ঝাঁপ দিল অন্ধকারে। হিরণ্ময় পাত্রের মুখের ঢাকা খুলতে চাইল জোর করে। অপাবৃণু, উন্মুক্ত হও, কার সেই উন্মাদ হাহাকার—'

ম্লান রেখায় হাসল সুষীমা। বললে, 'সময়ের ধুলো পড়ে পড়ে মনের মধ্যে সেই স্মৃতি ক্রমেই মলিন হয়ে আসছে।'

'জানি তাই আসবে। তাই আসুক। তবু যতদিন না আসে! যতদিন না আসে ততদিনই বুঝি তোমার ভালোবাসা মধুর হয়ে থাকবে। নুন যেমন ব্যঞ্জনকে স্বাদু করে তেমনি একটি দুঃখ তোমার প্রেমকে স্বাদু করে তুলবে।'

হাসল সুষীমা। বললে 'তার পর যখন একেবারে মুছে যাবে মন থেকে?'

'তখন আমাদের অভ্যাসের মুখস্ত খেলা। তাকেও বিরস বলব না। জীবনের কোনো অধ্যায়েই আমার অভিযোগ নেই। কেননা এ জীবন ঈশ্বরের নিজের হাতে লেখা বিচিত্র রূপকথা। প্রতি পৃষ্ঠায়ই তার আনন্দ, তার বিস্ময়। তবু সমস্ত প্রাপ্তির মধ্যে থাক একটু অতৃপ্তির সুর। সেই অতৃপ্তির সুর লেগে বাঁচাটাকে লোভনীয় করে তুলুক।'

একটু সকাল-সকালই বুঝি আফিস থেকে ফিরেছিল আজ অজয়। দেখল শোবার ঘরে একটা মোমবাতি জ্বালিয়েছে সুষীমা। আর সেই আগুনে পোড়াচ্ছে কখানি কাগজের টুকরো।

'এ কী, কী পোড়াচ্ছ?'

'আনন্দের কটা ডাল-ভাত চিঠি।' শেষ চিঠিটা আগুনে ধরে বললে সুষীমা।

'আহা, রাখলে পারতে চিঠি ক খানা! কেবা জানতে আসত! মাঝে মাঝে পড়তে লুকিয়ে। একটু বা বিষণ্ণ হতে। রূপে লাবণ্য আসত, তেজে নম্রতা।'

'না, আমি একেবারে নির্মুক্ত হলুম।'

'কিন্তু বলো', সুষীমার হাত ধরল অজয়, 'মুক্তি কি কোথাও আছে? দুঃখের থেকে, স্পৃহার থেকে, অতৃপ্তির থেকে?'

'আছে।' অজয়ের বাহুবন্ধনের মধ্যে চলে গেল সুষীমা। বললে, ভয়ের থেকে মুক্তি, দারিদ্র্যের থেকে, অশান্তির থেকে। আর তাই তো বাস্তবজীবন।'

—